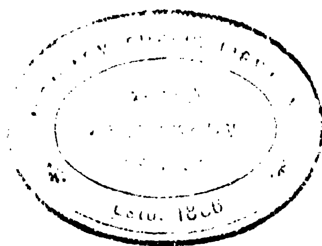
অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত



জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
মূল্য আড়াই টাকা
প্রচ্ছদ শিল্পী : রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী
পৌষ, ১৩৫২

মুদ্রাকর—শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য্য,
নিউ প্রেস, ১ রমেশ মিত্র রোড, কলিকাতা

ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

প্রিয়বরেষু

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের কর্ম্ম, সাহিত্য ও জীবন-দর্শনের সকল দিকের পরিচয় স্বল্প পরিসরে পরিবেষণ করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। কোন প্রসঙ্গই তাই এতে সবিস্তারে আলোচিত হয়নি—তবে উল্লেখযোগ্য কোন প্রসঙ্গই যাতে বাদ না যায়, অথবা পল্লবিত আলোচনার ভীড়ে কোন অপরিহার্য্য তত্ত্ব বা তথ্যও যাতে চাপা না পড়ে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে, আর আলোচনাও করা হয়েছে সর্ব্বত্রই যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠতা সহকারে।

এই বইয়ের কোন কোন অধ্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনকালেই বিভিন্ন সাময়িক পত্রে খণ্ড-প্রবন্ধ অথবা পুস্তক-পরিচিতি রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত আমার কোন কোন বই থেকেও কয়েকটি অধ্যায় এতে সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়েছে—তাছাড়া দুটি স্বকৃত ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদও রয়েছে। অবশ্য বেশীর ভাগই যে নূতন রচনা, সেকথা বলাই বাহুল্য। পরস্পর বিচ্ছিন্ন অধ্যায় গুলিকে একটি সংহত ও অবিচ্ছিন্ন আলোচনার সূত্রে গাঁথার জন্যে শ্রমের ত্রুটি করিনি, তবু দু-এক জায়গায় পুনরুক্তি দোষ রয়ে গেছে মনে হল, যা আগামী সংস্করণে শোধনের চেষ্টা করবো।

সব শেষে একটু ঋণ স্বীকারের প্রয়োজন আছে। সর্ব্বাধিক ঋণী আমি রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে, তাছাড়া বিশ্বভারতীর অন্যান্য বন্ধুদের এবং ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত অমলচন্দ্র হোম প্রমুখ রবীন্দ্রানুরাগী বিদ্বম্মণ্ডলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতাও আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বাঙালীর মনে জিজ্ঞাসার অন্ত নেই—সেই বহুমুখী জিজ্ঞাসার কতকটা পর্য্যন্ত উত্তরও যদি এই বইয়ের ভেতর দিয়ে দিতে পেরে থাকি, তাহলেই আমার প্রয়াস সার্থক মনে করবো।

যুগান্তর সম্পাদকীয় বিভাগ
২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভূমিকা

মানুষ অমর নয়—এমন কি, রবীন্দ্রনাথের মতো মহামানুষেরাও না। সুতরাং যত বড় বেদনারই হক, তাঁর মৃত্যুকে আমাদের স্বীকার করে নিতেই হবে। কিন্তু আমাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবন-ধারার ভেতর রবীন্দ্রনাথ নেই, এ কথা আমরা, যাঁরা তাঁরি ভাব-ভূমিতে ভূমিষ্ঠ, তাঁরি দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি জগৎকে, জীবনকে, তাঁরি ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেছি আপনাকে, ভাবতেই পারি না। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দেখেছি তাঁকে আমাদের সংস্কৃতির প্রাণ-পুরুষ রূপে—আমাদের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সমস্ত প্রচেষ্টার ভেতরই আমরা অনুভব করেছি তাঁর সমুদ্রের মতো বিরাট, সূর্য্যের মতো প্রদীপ্ত প্রতিভার প্রত্যক্ষ স্পর্শ। সময় বদলেছে, কালধর্ম্মে আমাদের জীবনে এসেছে দুঃসহ দুঃখ, আশাহত, আদর্শ-বিভ্রান্ত হয়ে আমরা বিরোধিতা করেছি অনেকের বিরুদ্ধে, হয়ত তাঁরো বিরুদ্ধে, কিন্তু অজ্ঞাতসারেই আমাদের ভাষা অনুসরণ করেছে তাঁকে—আমাদের অপরিসীম পিতৃ-ঋণ আমরা গোপন করতে পারিনি। সেই রবীন্দ্রনাথ কোন একদিন থাকবেন না, এ কল্পনাই আমাদের মনে স্থান পায় নি।

আমাদের পরে যাঁরা আসবেন, জানি তাঁদের কোথাও বাধবে না। তাঁরা কবিকে পাবেন তাঁর সৃষ্টির ভেতর—বর্ষণ-মুখর শ্রাবণের রাত্রে,

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ

বকুল-মদির ফাল্গুনের প্রভাতে, রৌদ্রবিদগ্ধ বৈশাখী দুপুরে, তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে তাঁর বিচিত্র গানগুলি। তাঁদের প্রণয়ে-বিরহে, আশায়-ব্যর্থতায় তাঁর কাব্য জোগাবে আর্তি ও আনন্দের, শান্তি ও সান্ত্বনার পরম পথ্য। তাঁদের রঙ্গালয় কল্লোলিত হয়ে উঠবে তাঁর নাটকের অভিনয়ে—তাঁদের গৃহাঙ্গনে গুঞ্জরিত হবে তাঁর গল্প, উপন্যাস, কাব্য ও কৌতুক রচনা—শিক্ষায়তন ও সংস্কৃতি-সভা পাবে তাঁর গদ্যসাহিত্য থেকে নব নব পথে দৃষ্টি ও চিন্তাকে প্রসারিত করবার পথ-নির্দেশ। সুদূরের পটভূমিতে দাঁড়িয়ে ভাবময় রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কল্পনাকে রাখবেন আচ্ছন্ন করে—যেমন রেখেছেন পৃথিবীর আর আর বরেণ্য কবিরা, হোমর, ভার্জিল, বাল্মীকি, কালিদাস, হাফিজ, ওমর, সেক্সপীয়র, চণ্ডীদাস-রা। কিন্তু তাঁরা কি জানবেন, কত বড় মহিমাময় পুরুষ ছিলেন এই রবীন্দ্রনাথ? তাঁর চোখে ছিল কি অসামান্য মনীষার দীপ্তি, তাঁর শুক্ল কেশে ও শুভ্র বেশে ছিল কি অসীম সঙ্গতির সুষমা, তাঁর কণ্ঠস্বরে ছিল কি বিচিত্র সঙ্গীত-স্পন্দন? এই পৃথিবীর পশুপক্ষী, গাছপালা, ফুলফল, আকাশ জলকে তিনি ভালো বেসেছিলেন কত গভীর মমতায়, কত নিবিড় অনুরাগে চেয়েছিলেন তিনি সমস্ত মানুষকে শান্তি ও সৌন্দর্য্যের বন্ধনে বাঁধতে—দূরকে তিনি নিকট করেছিলেন কি যাদু-মন্ত্রে, নিজেকে সহস্ররশ্মি রবির মতোই কি করে তিনি সীমাহীন সৌর-পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছিলেন! তাঁরা জানবেন না, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পরিচয়ও তাঁরা পাবেন না। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ হবেন শুধু কবি, শুধু মনীষী, শুধু ভাবুক।

কবি তিনি সন্দেহ নেই এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের অনেকের চেয়েও হয়ত শ্রেষ্ঠই, আর নিজের কবি-পরিচয়কেই তিনি সব চেয়ে বেশী

ভালোবাসতেন, এ-ও জানি। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি কি শুধু কবি? তিনি একটা যুগ—একটা শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির চলমান প্রতিভূ। আমরা সমসাময়িকরা ছাড়া তাঁর সেই সর্ব্বব্যাপিতা, সর্ব্বতোমুখিতা, সার্ব্বভৌমিকতা আর কে বুঝবেন? তাই অনাগত যুগ কোন দিনই তাঁকে হারাবেন না। সেদিনের তাঁরা ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করবেন, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের কোন কোন বিভাগে কি কি দান করেছেন, দেশের সঙ্গীতে, চিত্রকলায়, নৃত্যে ও অভিনয়ে এনেছেন কি কি নূতন আদর্শ, দেশের সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি কি কি নূতন মতবাদ প্রবর্ত্তিত করেছেন। সেই সঙ্গে হয়ত আবিষ্কার করবেন, কতদিন তিনি জমিদারী চালিয়েছেন, কোন কোন পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, স্বদেশী-আন্দোলনে কতটা অংশ গ্রহণ করেছেন, পৃথিবীর কোন কোন দেশে বেড়িয়েছেন, কার কার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন—হয়ত আহরণ করবেন তাঁর বিশ্বভারতীর ইতিবৃত্ত, তাঁর গার্হস্থ্য জীবনের বিবরণ, তাঁর লোক-কল্যাণকর বিবিধ অনুষ্ঠানের ইতিহাস। কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তিকে পরিব্যাপ্ত করে যে অখণ্ড রবীন্দ্রনাথ—জ্ঞানে, কর্ম্মে, বৈচিত্র্যে, ব্যক্তিত্বে, অভিজ্ঞতায় অতুলনীয় যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁদের কল্পনা তাঁর নাগাল পাবে না। তাই বার বার আজ মনে হচ্ছে, প্রতিভা অমর, মানুষ অমর নয়।

কিন্তু আমরা যাঁরা এই মহাপ্রতিভার স্নেহচ্ছায়া পেয়েছিলাম, জীবনের কোন কোন অধ্যায় যাদের মধুর হয়েছিল, মহনীয় হয়েছিল তাঁর মহিমময় ব্যক্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রভায়, কোন সান্ত্বনাতেই তারা ভুলতে পারে না যে তিনি নেই। তাঁর সেই অপার্থিব দ্যুতিময় দৃষ্টি, সেই ছন্দায়িত কণ্ঠস্বর, সেই প্রশান্ত ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি—এ তারা ভুলবে কি

করে? কি করে ভুলবে, কতখানি প্রসন্নতার সঙ্গে তিনি দীনতম বন্ধুটিকেও নিজের হৃদয়ের সান্নিধ্যে দিতেন—আলাপে-কৌতুকে আবৃত্তিতে-গানে তাঁর সর্ব্বদা উচ্ছল অন্তঃকরণকে অবাধে উজাড় করে দিতেন তারো কাছে? সূর্য্যের মতো বিশ্বকে যিনি ঘিরেছিলেন আপন দীপ্তিতে, তাঁর সেই মহিমান্বিত বর্ণচ্ছটার আড়ালে যে কি স্নেহসুকোমল প্রচ্ছায়শীতল শান্তির আশ্রয়ও ছিল, তা যারা জেনেছে, তাদের দুঃখ তাই শান্ত হবে না। তাদের সেই কাছের রবীন্দ্রনাথ নেই—সামান্য অসুখেই যাদের জন্যে এসে পৌঁছুতো হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, বিনা প্রার্থনাতেই যারা পেতো তাঁর আঁকা ছবি, নয়ত লেখা কবিতার উপহার—যাদের সমস্ত দাবী, সমস্ত খেয়ালই পূরণ করতেন যিনি সহাস্য ঔদার্য্যে—মহান হয়েও যিনি পারতেন নিজের মহত্বকে সংহত করে ছোটর কাছে ছোট হয়ে ধরা দিতে, সেই রবীন্দ্রনাথ নেই। রইলো তাঁর সাহিত্য, তাঁর বিশ্বভারতী, তাঁর বিচিত্র বহু কর্ম্মান্বিত জীবনের উজ্জ্বল অবিনশ্বর ইতিহাস—কিন্তু সমস্ত কীর্ত্তির অন্তরালে ছিলেন যে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, তিনি আর নাই।

আগামী যুগ তাঁকে দেখবে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। রবীন্দ্রসাহিত্য বলতেই তাদের চোখের সামনে ভেসে উঠবে একটা আদর্শ—একটা প্রাণবন্ত সংস্কৃতির ভাব-বিগ্রহ—যেমন আজ হয় বেদ-উপনিষদের নামে, বৈষ্ণব সাহিত্যের নামে। কিন্তু এই অক্ষয় সৌন্দর্য্যের, অমর সত্যের স্রষ্টা যে অসামান্য পুরুষেরা, তাঁদের কেন্দ্র করে আজ তরঙ্গিত হয় শুধু কল্পনা, শুধু বিস্ময়বিমুগ্ধ আবিষ্কৃতি। রবীন্দ্রনাথও হবেন তেমনি একটা ভাব, তেমনি একটা আদর্শ। আপন বিস্ময়কর সৃষ্টির অন্তরালেই তিনি থাকবেন প্রাণ-পুরুষ রূপে প্রচ্ছন্ন। কিন্তু সেদিন কে জানবে—এই যে

রবীন্দ্রনাথ, এঁকে আমরা দেখেছি, এঁর কথা আমরা শুনেছি, এঁর স্নেহ আমরা পেয়েছি? আমাদের ক্ষুদ্রতা, খর্ব্বতা, দীনতা, মূঢ়তাকে তিনি প্রীতি দিয়ে, ক্ষমা দিয়ে, সমবেদনা দিয়ে একদিন মধুর করে নিয়েছিলেন? আমরা ধুয়ে মুছে নিঃশেষিত হয়ে যাবো যেদিন মানুষের ইতিহাস থেকে, আমাদের স্মৃতির রবীন্দ্রনাথও চলে যাবেন সেই দিনই। আজ সেই রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ! আমরা রবীন্দ্রনাথের ভারতে ভূমিষ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের করুণায় উজ্জীবিত সাহিত্য-সন্ততিরা তাঁকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছি—আমাদের সেই রিক্ততার বেদনাকে আমরা আগামী কালের দরবারে পৌঁছে দিতে পারবো না হয়ত, কিন্তু এই বেদনা আমাদের কাছে কত বড়, তা কি বলে বোঝাতে পারি?

[২]

কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিলাম। সকালে, দুপুরে, বিকেলে, রাত্রে, প্রত্যহের রকমারি খুঁটিনাটি ব্যাপারের ভেতর থেকেই তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। নিজের ও অন্যের সঙ্গে তাঁকে সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও জীবন-দর্শন নিয়ে আলাপ করতে শুনেছি—নিতান্ত ঘরোয়া কথাবার্ত্তা, যা কোন দিনই তাঁর জীবনীতে লেখা থাকবে না, তা-ও শুনেছি অনেক। তাঁকে দেখেছি উৎসবে, অসুখে, বিপত্তিতে, দেখেছি কবিতা রচনায়, ছবি আঁকায়, আতিথ্য সংকারে। এক কথায় মানুষ রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সমস্ত অবস্থার ভেতরই ভালো করে দেখার আমার প্রচুর অবকাশ হয়েছে। তা সত্ত্বেও যখনি তাঁর

সামে গেছি, বা তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, তখনি মনে হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বের নাগাল পেলাম না। শুধু আমি কেন, তাঁর বহুদিনের অন্তরঙ্গ যাঁরা, যাঁরা তাঁর প্রায় সমবয়সী, তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করেও একই উত্তর পেয়েছি—আমাদের পরিমিত ব্যক্তি-সীমার এত ঊর্দ্ধেই তিনি ছিলেন যে ততদূর পৌছে, তাঁকে সম্পূর্ণ করে পাওয়া কারুরই সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে রবীন্দ্রনাথ যোগীর মতো আত্মানুভূতির তুরীয় লোকে নিজের ব্যক্তিস্বরূপ আবৃত করে রাখতেন, বা আত্মস্বাতন্ত্র্যবাদী ফিলিষ্টাইনের মতো সমাজ-জীবনকে উপেক্ষার দ্বারা দূরে ঠেকিয়ে রাখতেন। তাঁর সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে, তাঁরা বরং এটাই সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছেন যে তিনি খুব ছোটর কাছেও অত্যন্ত সহজ হয়ে নেমে আসতে পারতেন এবং যে অমায়িকতা আমরা, সাধারণ লোকেরাও অনেক সময় দেখাতে কুণ্ঠিত হই বা ভুলে যাই, তিনি তাই দিয়েই তাঁর অনুষঙ্গকে মধুর করে তুলতেন। আর এত অনায়াস প্রসন্নতার সঙ্গেই তা করতেন যে বাইরে থেকে অনেক সময় টেরও পাওয়া যেতো না তিনি কি এবং কে। অনেকটা তাঁর নিজের ভাষাতেই—

আমি বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো,
তবু শিশির টুকুরে ধরা দিতে পারি,
বাসিতে যে পারি ভালো!

তাঁর এই সহজ লভ্যতার অপব্যবহারও হতে দেখেছি। তিনি ছিলেন আমাদেরই মধ্যে, আমাদেরই মতো পাঁচ জনকে নিয়ে তাঁর জীবন কেটেছে ছোট-বড় সহস্র কাজের টানে। সাংবাদিক, সাহিত্যিক,

রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভূমিকা

রাষ্ট্রনেতা, শিক্ষক, সাধারণ ভ্রমণকারী নিত্য নিয়ত এসে ভীড় করেছেন তাঁর চারিপাশে—যাঁরা সশরীরে হাজির হননি, তাঁরাও হাজির হয়েছেন চিঠির পৃষ্ঠে ভর করে এবং সে চিঠিতে পাঠিয়েছেন হাজারো রকম দাবী-দাওয়ার বায়না। কিন্তু মজা এই যে তিনি কারুকেই বিমুখ করেননি, কোন কিছুতেই বিচলিত হন নি, সকলকেই সব কিছুকেই সহজ ভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন। আর তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন—তাঁর আত্মীয়েরা, তাঁর অন্তরঙ্গ কর্ম্মীরা, বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীরা. এমন কি, তাঁর পরিচারিকরা পর্য্যন্ত তাঁর আলাপের ও কৌতুকহাস্যের অংশীদার হয়েছেন সময়ে-অসময়ে। সেদিক থেকে সাধারণ সামাজিক মানুষ হিসাবে তাঁর মধ্যে গুরুতর কোন ক্রমভঙ্গ কেউ লক্ষ করেন নি—তাঁর সৌজন্য, মধুরতা এবং ঔদার্য্যেই বরং অনেকে লজ্জিত বোধ করেছেন। তাঁর সহিষ্ণুতা দেখে অবাকও হয়েছেন অনেকে।

কিন্তু একটু হুঁসিয়ার লোক মাত্রেই বুঝেছেন, এই যে তাঁর সহজ-লভ্যতা, এ বাহ্য—তাঁর হৃদয়-রহস্যের অতলে হাত বাড়াবার একটু চেষ্টাই যিনি করেছেন, তিনিই পিছিয়ে এসেছেন তার থৈ না পেয়ে। সে আলাদা রাজ্য—দুরধিগম্য অন্ধকারে সেখানে হচ্ছে নূতন নূতন সৃষ্টির পরিকল্পনা নিয়ে ভাঙাগড়া! অত বড় স্রষ্টা যে রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সৃষ্টির সেই বিরাট যন্ত্রশালার হদিশ বাইরে থেকে কে পাবেন, কি করে পাবেন? সন্দেহ হয়, তিনি নিজেই এ রাজ্যের কাজ-কারবার পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে টের পেতেন কিনা! ভেতরে তাঁর বাস করতো সম্পূর্ণ একটা আলাদা মানুষ, যে মানুষের অতি সামান্য অংশই রূপ পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে, বেশীর ভাগটাই চলে গেছে তাঁর সঙ্গে।

এই দ্বৈত-ব্যক্তিত্ব কম-বেশী সকল মানুষের জীবনেই দেখা গিয়ে থাকে। কিন্তু বাইরের মানুষটা দেখে ভেতরের মানুষটাকে নিত্যকার সংসারে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিনতে পারি। রবীন্দ্রনাথের বেলা এটা ছিল একেবারেই দুঃসাধ্য। তাঁর ভেতরকার যে কবি-সত্তার কথা বলছি, তা বস্তু-সংসারের মানবিক পরিচয়কে ছাপিয়ে এমন একটা জায়গায় সংলগ্ন হয়েছিল যে তাঁর ব্যক্তি-সত্তার অলিগলি ধরে সেখানে পৌছানো কারুর দ্বারাই হয়ে উঠতো না। তাই রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম পরিচয় তাঁর ঘনিষ্ঠেরাও কোন দিন সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কি না সন্দেহ। প্রাত্যহিক জীবনে তাঁকে দেখেছি নাংনী নন্দিনীর সঙ্গে কৌতুকহাস্যে বিগলিত হয়ে যেতে, আবার ভৃত্য বনমালীকে নিয়েও রস-রসিকতায় মেতে উঠতে—নন্দিনী ভেবেছেন দাদামশায় কি মিষ্টি, বনমালী মনে করেছে কর্ত্তাবাবা কি সহৃদয়! কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে বা রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গের বিচার-বিশ্লেষণে মশগুল হতেও দেখেছি। তাঁরা তাঁর কথার কারুকারিতায় মুগ্ধ হয়েছেন—তাঁর মনীষা প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যুক্তিসাদৃশ্য ও অলঙ্কার-সৌষ্ঠব দিয়ে বক্তব্যকে মনোজ্ঞ করে প্রকাশ করার অভিনবতায় বিস্মিত হয়েছেন। ভেবেছেন কি অসামান্য!

কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড অভিব্যক্তির সবগুলো একত্র করলেই অখণ্ড মানুষটিকে পাওয়া যেতো না। কারণ শুধু এইগুলির সমষ্টিই ত রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। চলতি অর্থে আমরা যাঁদের বলি অসাধারণ, তাঁদের অনেকের পরিচয় অবশ্য এই পর্য্যন্ত এসেই শেষ হয় এবং সে পরিচয়ও খুব প্রত্যাশিত নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বেলা এই মাপকাঠি চলা অসম্ভব ছিল। বাইরের প্রকাশ থেকে আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পেতাম, সে

রবীন্দ্র-সংস্কৃতির ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথও বিচিত্র মানুষ, অসামান্য মানুষ, কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অন্তরালে, সে রবীন্দ্রনাথ অন্য লোক। তাঁকে আমরা কেন, কেউই বোধহয় ধরতে পারে নি পূর্ণ ভাবে।

যে জিনিষটাকে বলছি কবির ভাব-জীবন, সেখানে তিনি ছিলেন অদোসর—সেখানে সঙ্গী-সাথী, অনুরাগী, বন্ধু, আত্মীয়-পরিজন কারুরই শক্তি হয় নি তাঁকে সান্নিধ্য দিতে। অসাধারণ সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল মন নিয়ে তিনি দেখেছেন বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, তার প্রত্যেকটি অবস্থান্তর, জীব-যাত্রার বিচিত্র খুঁটিনাটিকে তিনি যাচাই করেছেন সেই ভাবুক মনের কষ্টিপাথরে—এ দুইয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধকে আশ্রয় করে আবর্ত্তিত হচ্ছে যে অপার রহস্যের সমুদ্র, তার প্রত্যেকটি স্পন্দন ঘা দিয়েছে তাঁর অনুভবের তন্ত্রীতে, তাই উৎসারিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সৃষ্টিতে—এখানে কে তাঁকে সঙ্গ বা সাহচর্য্য দিতে পারতেন? এই একান্ত একক এবং অসন্দিগ্ধভাবে আত্মকেন্দ্রিক উপলব্ধি ও তাকে ব্যক্ত করবার কামনা তাঁকে, তাঁর ভাবসত্তাকে এমন ভাবেই সর্ব্বদা আবিষ্ট করে রাখতো যে প্রাত্যহিক বাস্তবের সঙ্গে কোন রকমেই এর যোগসাধন হতে পারেনি।

মনোধর্ম্মের এই দুরারোহতা অতিক্রম করে বস্তুসংসার আপন প্রত্যক্ষ চেহারায় তাঁর অন্তরের অন্দর মহলে ভালো করে ঢুকতেই পারে নি। বাস্তবের ওপর নিজের অন্তরকে আরোপ করে তিনি তাকে দেখে-ছেন আপনার আলোতে—তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ তাই লিরিকে। গল্প-উপন্যাস বা নাটকে তাঁর যে প্রকাশ, সে-ও লিরিক-ধর্ম্মের অনুরঞ্জনে রঙীন, তাই তার পেছনে প্রত্যক্ষের কাঠামো শক্ত নয়। সত্যকার যে রবীন্দ্রনাথ—তিনি হলেন প্রত্যক্ষতা থেকে বিচ্ছিন্ন, তিনি হলেন

একটা ভাব, একটা অপৌরুষের অনুভূতির বাহন—সেখানে তিনি নিঃসঙ্গ, সেখানে তিনি উদাসী।

কিন্তু আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন সংসারের অনতিক্রমণীয় কর্ম্ম-জালে একান্ত ভাবে জড়িয়ে এবং এদিকের দাবী-দাওয়ার সঙ্গে নিজেকে মানিয়েও নিয়েছিলেন আশ্চর্য্য নমনীয়তায়। তাই স্বামীরূপে, পিতারূপে, কর্ত্তারূপে, বন্ধুরূপে তাঁর যে ঘরোয়া জীবন, সেখানেও তাঁর ব্যতিক্রম হয়নি এক ফোঁটাও। অনেক স্বল্প প্রতিভাও যে সমস্ত অনাপোষের দরুণ অসামাজিক বলে দুর্নাম কিনেছেন, তিনি অত বড় প্রতিভাধর হয়েও সে সব জায়গায় নিখুঁত ভাবে খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। বাইরে থেকে এটা বিস্ময়কর মনে হয়। মনে হয়, ভেতরের সঙ্গে নিবিড় যোগ না থাকলে, বাইরে আগাগোড়া মানিয়ে পুষিয়ে চলা কি করে সম্ভব? অসম্ভব ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ মানুষ হিসাবে ত আমাদের স্তরের লোক ছিলেন না! বহির্জীবনকে সুষ্ঠু ও সুষমান্বিত করে নির্ব্বাহিত করার যে প্রেরণাকে বলে 'কালচার', তা তাঁর এত বেশী ছিল যে তারি সাহায্যে তিনি আসলে যেটা আপোষ, তাকেও মহিমান্বিত করে তুলতে পেরেছিলেন।

[৩]

অবশ্য তাঁর চলনে-বলনে আচারে-ব্যবহারে সর্ব্বদাই এবং সর্ব্বত্রই ফুটে উঠতো এমন একটা অলঙ্কৃত ঐশ্বর্য্যের আভিজাত্য, যা হঠাৎ দেখলে কৃত্রিম মনে হবার সম্ভাবনা ছিল। প্রায় সমস্ত ব্যক্তিক ব্যাপারেই দেখেছি, ব্যক্তি-সীমা ছাড়িয়ে তিনি অনায়াসেই একটা

নৈর্ব্যক্তিকতার স্তরে এসে উঠেছেন—এ-ও প্রখর বাস্তব দৃষ্টির বিচারে অকৃত্রিম মনে হবার কারণ ছিল না। কিন্তু এই ছিল তাঁর মনোধর্ম—এটা ভুল করলে, তাঁর চরিত্রের সর্ব্বোঙ্গিক আবেদনকেই ভুল করা হবে।

বাস্তব জীবনে রবীন্দ্রনাথ দুঃখ কম পান নি—বাল্যে তাঁর মাতৃ-বিয়োগ হয়, পিতা ছিলেন অনাসক্ত আধা-সন্ন্যাসী, তাই কি মাতা আর কি পিতা কারুর স্নেহই তিনি ভালো করে পাননি। পত্নীবিয়োগও তাঁর হয়েছিল যৌবনেই—তাছাড়া তাঁর পত্নী অনেক গুণের অধিকারিণী হয়েও শিক্ষা ও মননশীলতায় ঠিক তাঁর যোগ্য সহধর্ম্মিণী ছিলেন না, সুতরাং সেখানেও ছিল তাঁর খুব বড় একটা ঘাঁটতি। তারপর পরিণত জীবনে এসে একে একে তাঁর অনেকগুলি পুত্র-কন্যা লোকান্তরিত হয়েছে, এক সময় ব্যবসা-বাণিজ্যেও প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে তাঁকে, শান্তিনিকেতন স্থাপনের প্রাথমিক পর্ব্বে অর্থকষ্টও ভোগ করতে হয়েছে রীতিমতো—এছাড়া কি তাঁর প্রবর্ত্তিত সাহিত্যাদর্শের জন্যে, অথবা রাজনীতিক মতবাদের জন্যে, আর কি ব্যক্তিগত চাল-চলনের জন্যে, দেশবাসীর বিরোধিতা ও বিদ্রূপ, বক্রোক্তি ও আক্রমণ তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে প্রায় সারা জীবনই।

পরিণত বার্দ্ধক্যেও দেখেছি, তাঁকে শান্তিনিকেতনের একান্তে একক সাহিত্য-সাধনায় দিবারাত্রি আত্মনিমগ্ন থাকতে—পাঁচ জনের সেবা, সহযোগিতা ও দাক্ষিণ্যের আবেষ্টনে মধুরায়িত যে বার্দ্ধক্য সকলের কাম্য, তা ছিল না তাঁর। সাধারণ মানুষ হলে বলা যেতো, এ জীবন চরম রিক্ততার, পরম শূন্যতার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে যাঁরা কখনো দেখেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে তাঁর প্রাণে আনন্দের উৎসটি এত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্তই অব্যাহত ছিল। এই

পরিপূর্ণতার মূল হল তাঁর অন্তর্গূঢ় কবিসত্তা, আপন প্রাণৈশ্বর্য্যেই যা হয়েছে নিত্য নূতন রূপে-রসে উচ্ছ্বাসিত। কোন কিছুতেই আসেনি তাঁর অভ্যস্ততা, বাস্তবের মধ্যে থেকেও তিনি অনায়াসেই হতে পেরেছেন বাস্তবাতীত।

বাস্তব জীবনের ক্ষয়-ক্ষতি ভাঙা-গড়া তাঁর অস্তিত্বের ওপর পর্দ্দা দিয়ে ভেসে গেছে—ভেতরে তাঁর ছিল যে আত্মসমাহিত আর একটা মানুষ, তাকে বড় রকমের ঘা কেউই দিতে পারেনি কোন দিন। বস্তু-সংসার সম্বন্ধে তিনি ছিলেন একজন নিরপেক্ষ দ্রষ্টা ও উপভোক্তার মতো—এর সঙ্গে আপাদমস্তক নিজেকে জড়িয়ে গড়িয়ে একাকার হতে দেননি তিনি। তাই এর ভালো-মন্দ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সবই তাঁর সৃজনী-মনে গিয়ে বেজেছে মহান একটা ঐক্যতানের মতো। বলা যেতে পারে, এটা তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা, হয় তাই, কিন্তু স্রষ্টা যিনি তাঁর পক্ষে এটা তু নিন্দার কথা নয়। তাঁর জীবন-গঠনের প্রাথমিক সোপানগুলির মধ্যেই রয়েছে তাঁর এই আত্মকেন্দ্রিকতা বা আত্মগুপ্তির আদিসূত্রটি নিহিত।

তাঁর এই মনোধর্ম্মই প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টির ভেতর। তাঁর গল্প-উপন্যাসে বা নাটকে বস্তু-সংসার প্রতিফলিত হয় নি ভালো করে—লিরিকেও ব্যক্তিক অনুভূতি ব্যক্তি-সীমা ছাপিয়ে সার্ব্বভৌম অনুভূতির মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়েছে। এর মূল খুঁজতে হলে আমাদের যেতে হবে তাঁর জীবনের পূর্ব্বাপর ইতিহাসের ভেতর—সেখানে গেলেই সমাধান হয়ে যাবে সব সমস্যার। দেখা যাবে, অভ্যস্ত সমাজ-জীবনের সঙ্গে বাইরে থেকে যথাশক্তি সঙ্গতি রেখে চললেও ভেতরে ভেতরে ছিল তাঁর মস্ত একটা দূরত্ব এবং এই অনিবার্য্য দূরত্বটাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মননশীলতা ও জীবন-দর্শনের ভেতর দিয়ে।

[৪]

কর্মের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ যতবার এবং যত বেশী সাড়া দিয়েছেন, তাতে জীবনের প্রত্যক্ষ দাবী-দাওয়া ও বাস্তব দুঃখ-বেদনা সম্বন্ধে কোথাও তাঁর উদাসীনতা ছিল, একথা যেন সহসা মনেই হয় না। বাস্তবিকই কাজ তিনি কম করেন নি সারা জীবনে! যৌবনে জমিদারী চালিয়েছেন, ব্যবসা-বানিজ্য চালিয়েছেন, পত্রিকা সম্পাদন করেছেন, স্বদেশী-আন্দোলনে দায়িত্বজনক অংশ নিয়েছেন—প্রৌঢ় বয়সে শান্তি-নিকেতন শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালন করেছেন, জ্ঞানে-কর্মে বহিঃ-জগতের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধসূত্র প্রতিষ্ঠায় নায়কতা করেছেন—বার্দ্ধক্যেও দেশের জীবন ও মননের ক্ষেত্রে যখনি এসেছে কোন-না-কোন সঙ্কট-মুহূর্ত্ত, তখনি তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন তার পুরোভাগে। জালিয়ানা-ওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজদত্ত উপাধিত্যাগ থেকে সুরু করে, হিজলী বন্দীনিবাসে রাজনীতিক বন্দীর ওপর গুলি চালানোর প্রতিবাদ, অথবা কারাগারে অনশনব্রতী গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত, সমস্ত জাতীয় বিপর্য্যয়েই দেশ তাঁকে অগ্রণী হতে দেখেছে। এমন কি, শেষ রোগশয্যা থেকে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন রাথবোনের অশিষ্ট উক্তির প্রত্যুত্তরে, তাতেও তাঁর এই কর্ম্মতৎপরতারই পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে বিচিত্র কর্ম্ম-প্রবাহের ভেতর দিয়ে বয়ে গেলেও জীবনে তিনি কোন দিন একটা কাজকেই সমগ্রভাবে আশ্রয় বা অবলম্বন করে থাকেন নি, একমাত্র সাহিত্য-সাধনা ছাড়া—নিত্য নূতন কাজের ভেতর দিয়ে তিনি নিজেকে

প্রকাশ করে গেছেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁকে বারবার নূতন আঙ্গিক ও নূতন আদর্শের পরীক্ষায় নামতে দেখা গেছে। কখনো গল্প লিখেছেন, কখনো লিখেছেন উপন্যাস-নাটক, কখনো এসেছেন প্রবন্ধের ক্ষেত্রে। কখনো ধ্বনিগম্ভীর অলঙ্কৃত সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন, কখনো ধরেছেন আটপৌরে কথ্য ভাষাকে। এমন কি, বৃদ্ধ বয়সেও গদ্য-কবিতা, নৃত্যনাট্য, খোসগল্প ইত্যাদির অবতারণা তাঁর এই নূতন নিয়ে পরীক্ষার মনোভাবকেই প্রকটিত করে। প্রাত্যহিক জীবনে যেমন তিনি খাদ্য, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহের পরিবর্ত্তন করতেন মুহুর্মুহু, ভাব এবং কর্ম্মজীবনেও তেম্নি রীতি পরিবর্ত্তন করতেন কথায় কথায়। অভ্যস্ততার তিনি ছিলেন ঘোর বিরোধী।

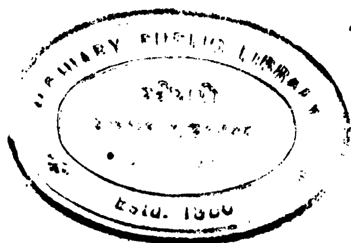
এই যে নিত্য নূতনের ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করার সজীবতা, শিল্পী হিসাবে এই তাঁকে দিয়েছে অতখানি সাফল্যের প্রবর্ত্তনা—আবার কর্ম্মী হিসাবে এতেই ঘটেছে তাঁতে বস্তুনিষ্ঠতার ব্যতিক্রম। আসলে তিনি ছিলেন ভাবের মানুষ—এক-একটা ভাবের বন্যা এসেছে, আর তাই তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে এক-একটা কাজের ভেতর। যেই উদ্দীপনা ক্লান্ত হয়েছে, এসেছে বাস্তব কর্ম্ম-সঙ্ঘাত, অম্নি তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছেন—নিজেকে নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত করে এনেছেন। আকস্মিক ভাবে একদিন যে স্বদেশী-আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন, এই হল তার প্রকৃত কারণ। হঠাৎ একদিন জমিদারী তদারক ও বিশ্বভারতী পরিচালনের ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন, তারো এই কারণ।

যে পরিবারে তাঁর জন্ম, যে পরিবেশে তিনি মানুষ, তাতে আত্ম-সঙ্কোচনের প্রয়োজন তাঁর হয়েছে বাল্যকাল থেকেই। আপন ভাব-কল্পনার মধ্যেই তাঁকে বেশীর ভাগ সময় সঙ্গ ও সাহচর্য্য, আশ্রয় ও অবলম্বন

খুঁজতে হয়েছে। জীবনে পিতা-মাতার স্নেহ তিনি পূর্ণ ভাবে পান নি, ভাই-বোনেরা বয়সে এত বড় ছিলেন যে তাঁদের কাছ থেকে তিনি সমবয়সীর সখ্য লাভ করেননি, স্কুল-কলেজে যান নি--তাই সহপাঠী সুহৃদ পান নি, পত্নীর সঙ্গেও মননশীলতার অসমানতা হেতু হয়ত পূর্ণাঙ্গ ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয়নি। আবার সমৃদ্ধ গৃহে জন্মানোর ফলে শিক্ষার জন্যে, আশ্রয় ও অন্নবস্ত্রের জন্যে কোন দুঃখ ভোগ করতে হয় নি, কারুর মুখাপেক্ষী হতে হয় নি, তাছাড়া পারিবারিক শাসন ও সতর্কতার আওতায় মানুষ হওয়ায় ভালো-মন্দ নির্ব্বিশেষে সর্ব্বস্তরের সংস্রবে এসে জীবনের প্রত্যক্ষ চেহারাটা ভালো করে দেখারও সুযোগ হয় নি। স্বভাবতই তিনি সকলের মধ্যে থেকেও থেকেছেন সকলের একান্তে, এবং সেই একাকিত্বের শূন্য পূর্ণ করেছেন অধ্যয়ন ও কল্পনার ঐশ্বর্য্য দিয়ে। তাই বস্তু-সংসারের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার চেয়ে ভাব-কল্পনার সঞ্চয়ের ওপরই তাঁকে বেশী করে নির্ভর করতে হয়েছে। প্রত্যক্ষ জীবনের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুঃখ-বেদনা, আঘাত-সঙ্ঘাতের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় কমই হয়েছে, অথচ দূর থেকে তাঁর সংবেদনশীল কবিচিত্তে এই জীবনের বেদনা কল্পনা পাখায় ভর করে এসে সঞ্চারিত হয়েছে। তারি আহ্বানে তিনি ছুটে গেছেন কর্ম্মের অভিমুখে—কিন্তু নিজেকে টিঁকিয়ে রাখতে পারেন নি সেই সঙ্ঘর্ষের মধ্যে। তাঁর ভাব-প্রকৃতিই বাধা দিয়েছে তাতে।

দেশের দারিদ্র্য, দুর্দ্দশা ও অনগ্রসরতা তাঁকে পীড়িত করেছে, তার প্রতীকারও তিনি চেয়েছেন আন্তরিক ভাবে—জ্ঞানে-কর্ম্মে, শিক্ষায়-সংস্কারে দেশের লোক বড় হক, মানুষ হক, সমস্ত ভেদ-বিভেদ ভুলে সকলে এক হক, এই ছিল তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন। স্বদেশী-আন্দোলন,

শিক্ষা সংস্কার, সাহিত্য সাধনা, সমস্ত কাজের মধ্যে দিয়েই তাঁর এই স্বপ্ন রূপায়িত হয়েছে। এই স্বপ্নের অনুপ্রেরণাই তাঁকে দেশের সামাজিক অব্যবস্থার প্রতি আকৃষ্ট করেছে—সেখানকার অনাচার, কদাচার, অন্যায়, অনৈক্যকে তিনি আঘাত করেছেন নির্ম্মম হাতে এবং যা সুস্থ, যা কল্যাণপ্রদ, তাকে সংস্থাপিত করতেও চেয়েছেন তিনি। কিন্তু এই বেদনাবোধ ও কল্যাণকামনা যতটা আদর্শের, ততটা বাস্তবের নয়—দেশের চাষী, মজুর, দীনদুঃখী, নিরন্ন, নিরাশ্রয়ের যে জীবন-বেদনা, তার মর্ম্মদেশ পর্য্যন্ত পৌঁছুবার সুযোগ এবং সুবিধাই তাঁর হয় নি। নিম্ন মধ্যবিত্তের পরিচিতিও তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে খুব কমই। তিনি যে শ্রেণীতে জন্মেছিলেন, সেই শ্রেণী-জীবনের গণ্ডীকে তিনি ছাড়িয়ে উঠেছিলেন শুধু ভাবের প্রেরণায়, কল্পনার উত্তাপে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বস্তু-জীবনে ত নয়ই, ভাব-জীবনেও তিনি শ্রেণী সচেতনতাকে ষোল-আনা বর্জ্জন করতে পারেন নি। তাঁর জীবন-দর্শনের আদি সূত্রটি আবিষ্কার করতে গেলেই দেখা যাবে, পুরাণো তপোবন সংস্কৃতিকেই তিনি ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন, উপনিষদের সাম্য, শান্তি ও সৌন্দর্য্যবাদই তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল—ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যানকে তিনি আমল দেন নি। এই শান্তিবাদই তাঁকে জাতীয়তার গণ্ডী অতিক্রম করে, আন্তর্জ্জাতিকতার অভিমুখে নিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু যে রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাসে বিশ্বের প্রকৃত শান্তি সম্ভব, তাকে তিনি গ্রহণ ও স্বীকার করেন নি। আদর্শবাদী মন তাঁর একান্ত ভাবে সমর্থন করেছে আধ্যাত্মিকতার প্রসারকে।



কবিতা ও গান

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্য নিয়ে সম্যক আলোচনা এত অল্প পরিসরে হওয়া সম্ভব নয়। আমরা মোটামুটি ভাবে তাঁর কাব্যের শ্রেণীবিভাগ ও প্রাথমিক পরিচয়েই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। চোদ্দ-পনেরো বৎসর বয়স থেকে সুরু করে একেবারে জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত তিনি যত কবিতা ও গান লিখেছেন, সংখ্যায় তা যেমন অপরিমিত, বৈচিত্র্যে তেমনি অসাধারণ। নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধ তিনি যা লিখেছেন, সব বাদ দিলে, এমন কি নাট্য-কবিতাগুলি বাদ দিলেও, একমাত্র লিরিক কবিতা ও গানেই তিনি পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবির রেকর্ড ভঙ্গ করে গেছেন। লিরিক কবিতা কথাটি আমরা এখানে একটু ব্যাপক অর্থে নিয়েছি—কাব্য সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের যা-কিছু দান, যথা চতুর্দ্দশপদী কবিতা (সনেট), আখ্যান কবিতা, নীতি কবিতা, তত্ত্ব কবিতা, প্রেম কবিতা, রঙ্গ কবিতা, বর্ণনাত্মক কবিতা, ছন্দ-হিল্লোলের কবিতা, আত্মবীক্ষা সূচক কবিতা, ভগবদ্ভক্তি মূলক গান, মানবিক প্রেমের গান, প্রকৃতি সঙ্গীত—সব কিছুকেই আমরা মোটা হিসেবে লিরিক কবিতার অন্তর্ভুক্ত করেছি। নিছক রসাত্মক লিরিক বলতে যা বোঝায়, এদের কোন কোন বিভাগ তার বাইরে পড়ে সন্দেহ নেই—কারণ কবির নিজস্ব ভাবানুভূতি থেকে বিচ্ছিন্ন বিষয়াত্মক রচনাকে লিরিক আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে প্রাণ-ধর্ম্ম

সর্ব্বত্রই এমন সজাগ যে তাঁর একান্ত বস্তুগত রচনাতেও তাঁর ব্যক্তি-মনের ছায়া পড়েছে—কাজেই তাঁর সমুদয় কাব্য-সাহিত্যকেই চলতি বিচারে আমরা লিরিক শ্রেণীভুক্ত করতে পারি।

এই বহু শাখায় বিভক্ত কাব্য-ধারার সম্যক আলোচনা থেকে কবির দৃষ্টিভঙ্গী, মনন রীতি ও প্রকাশ-বিধির যে ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাতে বোঝা যায় যে একেবারে গোড়া থেকেই তিনি কয়েকটি নূতন সুর নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা দিনে দিনে বিচিত্র অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে পরিপুষ্ট এবং সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই নূতন দৃষ্টির পিছনে সম-সাময়িক কালের বাংলা সাহিত্যের বিশেষ কোন প্রভাবই ছিল না। কবির বাল্যকালে এদেশে চলছে উপাখ্যান-কাব্যের যুগ, মধুসূদন, হেম-চন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিরা সেদিন দেশকে দেশাত্মবোধ, মনুষ্যত্ব ও ধর্ম্মজ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করার কাজেই তাঁদের লেখনী নিয়োজিত করেছিলেন। একক মনের অনুভূতি—সুখে-দুঃখে আশায়-আশঙ্কায় নিত্য-তরঙ্গিত জীবনের প্রাণ-স্পন্দন—তাঁদের সাহিত্যে দুর্লভ। এই প্রাণ-ধর্ম্ম বর্জ্জিত বলেই তাঁদের কাব্যে বহিঃপ্রকৃতিও প্রাণহীন, তাতে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সবই আছে, কিন্তু মানব-মনের সঙ্গে তাদের কোন অন্তরঙ্গ যোগ নেই—জীবনকে তাঁরা দেখেছিলেন কতকগুলি অনুষ্ঠানের সমষ্টিরূপে, প্রকৃতিকে তাঁরা দেখেছিলেন কতকগুলি উপকরণের আধার রূপে, তাই বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানবাত্মার নিগূঢ় যোগকে আশ্রয় করে জন্মায় যে লিরিক কবিতা, তা লেখা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয়নি। 'সারদা মঙ্গলে'র কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীই সর্ব্বপ্রথম এই দিক থেকে বাংলা কবিতার স্রোত ফেরালেন। সেখান থেকেই বাংলা গীতিকাব্যে নবযুগের সূচনা।

কবি বিহারীলালের দৃষ্টিতে নিজস্বতা ও প্রকাশ-ভঙ্গীতে আত্ম-

কেন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ঘূর্ণ্যমান নীহারিকার মতো নূতন সৃষ্টির আবেগে উচ্ছৃঙ্খল, অনেক স্থানেই তা সংহত হয়ে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথ প্রথম চলার প্রেরণা এই খান থেকেই আহরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু প্রথম প্রয়াসেই তিনি পূর্ণাঙ্গ কবির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র সূচনার কবিতাটিতেই এর আভাষ পাওয়া যায়—

সে গান না শোনে কেহ যদি
যদি তারা হারাইয়া যায়,
সন্ধ্যা তুই সযতনে গোপনে বিজনে অতি
ঢেকে দিস আঁধারের ছায়।
যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন,
সেই খানে সযতনে রেখে দিস গানগুলি
রচে দিস সমাধি-শয়ন।

মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র যে 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন, সে এর ভেতর ভাবী রবির অরুণোদয় লক্ষ্য করেছিলেন বলেই। অবশ্য 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' বা এর অব্যবহিত পরবর্ত্তী 'প্রভাত সঙ্গীত', 'কড়ি ও কোমল', 'ছবি ও গান' প্রভৃতি বইয়ে কাঁচা হাতের ছাপ প্রায় সর্ব্বত্রই সুপ্রকট। প্রকাশের আকুলতায় কবির অন্তর উদ্বেলিত হচ্ছে, ভাষা ভাবের থৈ পাচ্ছে না, এই রকমই বেশীর ভাগ কবিতা। সেই জন্যেই কবি 'মানসী'র পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁর যা-কিছু কবিতা, তাকে খাঁটি জাতের কাব্য বলে স্বীকার করতেন না। বলা বাহুল্য আমরাও তা করি না। কিন্তু রবীন্দ্র-কাব্যের মূল সুর এই প্রাথমিক কবিতা গুলিতেও শোনা যায়, যা

পরবর্ত্তী কালে হয়ত অধিকতর প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। 'প্রভাত সঙ্গীতে'র—

পেয়েছি এত প্রাণ, যতই করি দান,
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে—
আয় রে মেঘ আয়, বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যা রে !

কিংবা—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

অথবা 'কড়ি ও কোমলে'র—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য-করে, এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই !

কিংবা—

যাত্রা করি বৃথা যত অহঙ্কার হতে,
যাত্রা করি ছাড়ি হিংসা-দ্বেষ,
যাত্রা করি জ্যোতির্ম্ময়ী করুণার পথে
শিরে ধরি সত্যের আদেশ।
যাত্রা করি মানবের হৃদয়ের মাঝে,
প্রাণে লয়ে প্রেমের আলোক,
আয় মাগো যাত্রা করি জগতের কাজে—
তুচ্ছ করি নিজ দুঃখ-শোক।

অথবা—

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতি প্রাণ,
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।
সসীমে উঠিছে প্রেম শুধিবারে অসীমের ঋণ,
যত দেয় তত পায়, কিছুতে না হয় অবসান।
যত ফুল দেয় ধরা তত ফুল পায় প্রতিদিন—
যত প্রাণ ফুটাইছে ততই বাড়িয়া উঠে প্রাণ।
যাহা আছে তাই দিয়ে ধনী হয়ে উঠে দীন হীন,
অসীম জগতে এ কি পিরীতির আদান-প্রদান!

বিশ্ব-প্রকৃতি, জীবন, ও মানব-সংসার সম্বন্ধে কবির যে সমস্ত মতবাদ সর্ব্বজন বিদিত, অপরিণত বয়সের এই অস্বচ্ছ অনুভূতির বীজ থেকেই পরবর্ত্তী কালে তা ফলে-পুষ্পে-সমৃদ্ধ বনস্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সৌন্দর্য্য, বিশ্ব-কল্যাণ, প্রকৃতির ভেতর মানবিক সত্তার উপলব্ধি—এক কথায় রবীন্দ্র-কাব্যের মূল-সুর যা, সবই পাওয়া যায় এই সব কবিতায়। 'মানসী' থেকে তাঁর কাব্যের আঙ্গিক বিন্যাসে এসেছে বৈচিত্র্য, দৃষ্টির প্রসার বেড়েছে, তা হয়েছে অনেক বেশী অন্তর্মুখী, কিন্তু মৌলিক প্রকৃতিতে তা খুব বেশী বদলায় নি। আদি থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীর এই অক্ষুণ্ণ পারম্পর্য্য লক্ষ্য করেই স্বর্গীয় অজিত চক্রবর্ত্তী কবির কাব্য-দৃষ্টির অন্তর্লগ্ন একটি মূল সূত্র আবিষ্কার করতে চেষ্টা করেন এবং 'চিত্রা' কাব্যের 'জীবন-দেবতা' বা 'চিত্রা' কবিতায় এসে তার সন্ধান পেয়েছেন বলে মনে করেন।

তাঁর মতে, জীবন-দেবতাই হল রবীন্দ্র-কাব্যের আসল সুর। আর সমস্ত সুরই হল তার অনুপূরক। এই জীবন-দেবতাই হলেন কবির

'অসীম', 'চিরসুন্দর', 'লীলাসঙ্গী', তিনিই কবির 'তুমি'। তিনি কখনো কান্ত, কখনো রুদ্র, কখনো প্রকট, কখনো প্রচ্ছন্ন। কখনো তিনি গুহান্বিত প্রাণ-শক্তি রূপে স্ফূর্ত্ত হচ্ছেন জগৎ-রহস্যের বিবিধ রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে, কখনো বা ধরা দিচ্ছেন সহজ হয়ে, প্রাত্যহিক জীবনের ছোট-বড় সমস্ত ব্যাপারের ভেতর দিয়ে। 'গীতাঞ্জলি', 'গীতমাল্য' প্রভৃতির গানে, 'ক্ষণিকা', 'চিত্রা', 'সোনার তরী' প্রভৃতির অনেক কবিতায় এবং 'লিপিকা' প্রভৃতির কোন কোন নিবন্ধে এই একই সুর, একই দৃষ্টি আবর্ত্তিত হয়েছে নানা ভাবে। 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' থেকে 'সোনার তরী' পর্য্যন্ত, 'সোনার তরী' থেকে 'মহুয়া' পর্য্যন্ত একটানা এই অনুভূতির খেলাই চলেছে। অজিত বাবুর এই জীবন-দেবতাকে ইয়েটস ইংরাজী 'গীতাঞ্জলি'তে 'ঈশ্বর' বলেই গ্রহণ করেছেন—কেউ কেউ এঁকে কবির মানসী বা কাব্য-লক্ষ্মী বলেও বুঝিয়েছেন। বস্তুত অনেক কিছুই আরোপিত হয়েছে এই 'তুমির' ওপর।

আবার একদল বলেছেন, সৃষ্টি-মূলক অভিব্যক্তির (Creative-evolution) অন্তর্লগ্ন গতিবাদই হল তাঁর কাব্যের মূল সুর—'বলাকা'র 'নদী' কবিতায় এসে তাঁর এই গতিবাদ পূর্ণতা লাভ করেছে, কিন্তু 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' থেকেই চলেছে তার ধারা, যা 'মানস-সুন্দরী', 'বসুন্ধরা', 'নিরুদ্দেশ যাত্রা', 'সোনার তরী' নানা কবিতাতেই পাওয়া যায়। এই অভিব্যক্তির মর্ম্মগত যে প্রাণ-সত্তা (Elan Vital), তাই হল কবির 'তুমি'—ইনি ঈশ্বর নন, কাব্য-লক্ষ্মী নন, ইনি বস্তুরই দিব্যশক্তি, যা জড় বিশ্বকে করেছে চৈতন্যময়, সসীমকে করেছে অসীমের সঙ্গে সংযুক্ত। রবীন্দ্র-কাব্য এঁদের মতে এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ারই রসান্বিত ব্যাখ্যান।

বলা বাহুল্য যে এই সমস্ত ব্যাখ্যান কতকটা পর্য্যন্ত প্রাসঙ্গিক হলেও, সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধেই এই শ্রেণী-নির্ণয় প্রযোজ্য হতে পারে না। কতক গুলো কবিতা আছে, যাদের প্রথম দৃষ্টিতেই এদের এলাকার বাইরে বলে বোঝা যায়। 'কথা ও কাহিনী'র আখ্যান কবিতা, 'কাহিনী'র নাট্য কবিতা, 'কণিকা'র নীতি কবিতা, 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথে'র শিশু কবিতা, 'পলাতকা'র গল্প কবিতা, 'নৈবেদ্যে'র ধর্ম্মমূলক ও দেশাত্মবোধক কবিতা, 'হিং-টিং-ছট', 'জুতা আবিষ্কার' প্রভৃতি হাসির কবিতা, এবং সাধারণ প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানব-জীবন ও বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কবিতা, যা রবীন্দ্র কাব্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ, তা এই দার্শনিক জাতি-বিচারের গণ্ডীতে পড়ে না। শুধু তাঁর 'তুমি'-মূলক কবিতাগুলি, যার ভেতর প্রেম কাব্য, প্রকৃতি কাব্য দুই-ই ধরা যায়, তাই নিয়েই চলতে পারে এ বিচার। সেদিক থেকে জীবন-দেবতাবাদই হক, আর গতিবাদই হক, আর অন্য যে কোন দার্শনিক মতবাদই হক, কবির ওপর আরোপ করা যেতে পারে। অবশ্য এই জাতের কবিতা গুলোই হল খাঁটি লিরিক এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সমালোচকরা দাবীও করছেন লিরিক কবিতা সম্বন্ধেই।

কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে যে-কবিতা গুলোর উল্লেখ আমরা করেছি, তা-ও কবির লেখনীর by-product নয়, কোন বিশেষ সময়ে বা অবস্থায় এদের তিনি পৃথক করেও লিখেননি—তাঁর সমগ্র কাব্য-প্রবাহের ভেতর দিয়ে অন্যান্য শ্রেণীর কবিতার সঙ্গেই এরাও উৎসারিত হয়ে এসেছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-সংসার থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করে দেখা চলে না। কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে পাশ্চাত্যদেশে রবীন্দ্রনাথ খ্যাত Oriental Mystic (প্রাচ্য দেশীয়

মরমী) রূপে, এদেশে তাই ইউরোপীয় সমালোচনার প্রতিধ্বনি করেই তাঁর কাব্য-সাহিত্যকে কোন-না-কোন একটা দার্শনিক অনুক্রমে বাঁধবার চেষ্টা হয়েছে। তাই অনাবশ্যক ভাবেই অতিশয় সরল ও সহজবোধ্য রচনাকেও দার্শনিকতার আওতায় ফেলে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হয়েছে এবং যেখানে সামান্য একটু সুর বা ছোট একটি ছবি মাত্র কবি দিতে চেয়েছেন, সেখানেও জীবাত্মা-পরমাত্মা সংক্রান্ত তত্ত্ব এনে হাজির করা হয়েছে। উপনিষদ, বার্গসোঁর দর্শন এবং আরো কত-কি আরোপ করেই তাঁর কাব্যিক স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করতে পারি 'সোণার তরী'র গোড়ার কবিতা—

> গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা,
> কূলে একা আছি বসে নাহি ভরসা।
> রাশি রাশি ভারা ভারা, ধান-কাটা হল সারা।
> ভরা নদী ক্ষুরধারা খরপরশা,
> কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরষা।

এই কবিতার 'আমি' কে, 'ধান' কি, 'নদী' ও 'সোনার তরী' কার প্রতীক, তা নিয়ে তর্কাতর্কি হয়েছে প্রচুর এবং শেষ পর্য্যন্ত স্থির হয়েছে যে জন্ম ও কর্ম্মফল ঘটিত রহস্যেরই এ একটি রূপক ব্যাখ্যান। কিন্তু আসলে এ যে সহজ কবি-কল্পনা, যাতে স্বভাবোক্তির সঙ্গে ভাবানুভূতির যোগে মধুর একটি রসার্দ্রতা জমে উঠেছে, তার বেশী কিছুই নয়, এ কথা কারুরই মনে হয়নি। 'বলাকা'র কবিতা গুলো সম্বন্ধেও একই বিপাক হয়েছে—যেহেতু তার কোন-কোনটায় তত্ত্ব আছে, সেই জন্যে তত্ত্ব-প্রচারকেই এই কাব্যের একমাত্র লক্ষ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। 'বলাকা', 'নদী', 'সাজাহান' সমস্ত কবিতাতেই কবির রস-কল্পনা যে

বিচিত্র সৃষ্টির সম্ভার মেলে ধরেছে, তা Creative evolution-এর রূপক ব্যাখ্যান, কাব্যত্ব তাতে গৌণ, এ কথা রসিকের উক্তি নয়।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি—
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
তরুশ্রেণী চাহে পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি
ঐ শব্দ-রেখা ধরি চকিতে হইতে দিশেহারা
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।

প্রভৃতি অংশকে সমস্ত দার্শনিক তত্ত্ব-জল্পনা থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিলেও, নিছক কাব্য হিসাবেই সম্যক উপভোগ করা যায় না কি? 'মহুয়া'কাব্যের কান্তা-প্রেমকেও অনুরূপ দার্শনিক ব্যঞ্জনা দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে —তার লৌকিক কাঠামো এত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও পণ্ডিত সমাজ এই কবিতাগুলির ওপর তত্ত্বের ছুরি চালাতে পেছপা হননি। অথচ—

পথ বেঁধে দিল, বন্ধনহীন গ্রন্থি,
আমরা দু'জন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙীন নিমেষ ধূলার দুলাল,
পরাণে ছড়ায় আবির গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত!

অথবা—

বলো তারে বলো
এতদিনে তারে দেখা হল।
তখন বর্ষণ শেষে, ছুঁয়েছিল রৌদ্র এসে
উন্মীলিত গুলমোরের থোলো।
বনের মন্দির মাঝে, তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের ওঠে স্তবগান।
চোখে জল বয়ে যায়, নম্র হলো বন্দনায়,
আমার বিস্মিত মন-প্রাণ।

প্রভৃতি কবিতাও নিছক প্রেমের কবিতা, নর-নারীর বাস্তব অনুভূতিকে আশ্রয় করে উৎসরিত যে প্রেম, তারি কবিতা, একথা আমরা সবিনয়ে নিবেদন করে রাখতে চাই। একজন বিদেশী লেখক বলেছেন, 'There is no stage of human thinking, no aspect of nature that does not manifest in Rabindranath. Sometimes he is a mystic indeed, but oftentimes a sensuous observer, a lover and what more, a critic.'

আর একজন সমালোচকও বলেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট দার্শনিক সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো যায় না। তিনি মানব-জীবনের প্রায় সমস্ত সুরকেই স্পর্শ করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন স্তরে তাঁর দৃষ্টি ও মননশীলতা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। নিজের দেশ সম্পর্কে তিনি দেশ-প্রেমিক, আবার বহিঃপৃথিবী সম্পর্কে বিশ্ব-প্রেমিক। প্রেম সম্পর্কে তিনি আদর্শবাদী, কিন্তু প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষানুরাগী। শিশুর প্রতি তিনি দার্শনিক মনোভাব সম্পন্ন, নারীর প্রতি কান্ত-

ভাবাপন্ন। ঈশ্বর সম্বন্ধে কখনো তিনি লীলাবাদী, কখনো পৌত্তলিক, কখনো বা নিরীশ্বর প্রাকৃতিক শক্তির উপাসক। ব্যক্তি-সংস্রব বিচ্ছিন্ন ভাব-জগৎ অনেক সময় তাঁর অবলম্বন, অনেক সময় দেহাতীত কল্পলোক তাঁর আশ্রয়—কখনো তিনি পলায়নপর, কখনো বিদ্রোহী, কখনো বা সংশয়ী। কখনো সংস্কারক রূপে প্রচলিত বিশ্ব-ব্যবস্থাকে তিনি ভেঙে তৈরী করতে চাইছেন, কখনো এর সুষমা ও সৌন্দর্য্যে আত্ম-নিমগ্ন হয়ে যাচ্ছেন, কখনো আবার এ-সবের ঊর্দ্ধে উড়ে যাচ্ছেন স্বপ্নের পাখায় ভর করে। এমন একজন সর্ব্বতোমুখী কবিকে আমরা শুধু মরমীয়াদের গণ্ডীতে যেন আবদ্ধ না রাখি, কারণ সে হল তাঁর খণ্ড একটি পরিচয়।'

উদ্ধৃত অংশেই মোটামুটি ভাবে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যের বিস্তৃতি, বৈচিত্র্য ও বহুমুখিতার প্রাণ-পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। শুধু আর একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার। এই সব খণ্ড-অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে কবির যে অখণ্ড ভাব-রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তাতে কোথাও পরস্পর-বিরোধিতা নেই, সমস্ত শাখা-নদীই উৎসারিত হয়েছে এক মহানদী থেকে, যার মূল রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তার স্বরূপ নির্ণয় বা তাঁর সৃষ্টির বিজ্ঞানসম্মত সংজ্ঞা নির্দ্ধারণ কঠিন হলেও হয়ত অসম্ভব নয়।

অন্য সব শ্রেণীর কবিতার কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা এখানে শুধু তাঁর আত্মকেন্দ্রিক লিরিক সম্বন্ধেই আর দু-একটি কথা বলবো। ব্যক্তিক রচনায় সাধারণত কবির আত্ম-পরিচয় প্রচ্ছন্ন—সে কি গদ্যে আর কি পদ্যে। আত্মবীক্ষার আলোয় তাঁর লিরিক অনেক সময়ই উজ্জ্বল প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, কিন্তু সে আলো কবির বক্তি-স্বরূপকে আশ্রয় করে

ছড়িয়ে পড়ে নৈর্বক্তিক বিশ্বমানবের ওপর। সেই বাস্তব-বিমুখ ভাবাত্মকতাই তাঁর লিরিকের প্রধান লক্ষণ। দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক—

হায় এমনি করে কি ওগো চোর
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
চোখে বিছাইয়া দিবে ঘুম ঘোর
করি হৃদিতলে অবতরণ!
তুমি এমনি কি ধীরে দিবে দোল
মোর অবশ বক্ষ-শোণিতে?
কানে বাজাবে ঘুমের কলরোল
তব কিঙ্কিণী রণরণিতে।
শেষে পসারিয়া তব হিম-কোল
মোরে স্বপনে করিবে হরণ।
আমি বুঝি না যে কেন আসো-যাও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।

অথবা—

তবু তুমি একবার খুলিয়া দক্ষিণ দ্বার
বসি বাতায়নে—
সুদূর দিগন্তে চাহি কল্পনায় অবগাহি,
ভেবে দেখো মনে,
একদিন শতবর্ষ আগে
চঞ্চল পুলক রাশি কোন স্বর্গ হতে ভাসি
নিখিলের মর্মে আসি লাগে।

নবীন ফাল্গুন দিন সকল বন্ধনহীন
উন্মত্ত অধীর,
উড়ায়ে চঞ্চল পাখা পুষ্পরেণু গন্ধমাখা
দক্ষিণ সমীর,
সহসা আসিয়া ত্বরা রাঙায়ে দিয়েছ ধরা
যৌবনের রাগে,
তোমাদের শতবর্ষ আগে।
সেদিন উতলা প্রাণে, হৃদয় মগন গানে
কবি এক জাগে।
কত কথা পুষ্প প্রায় বিকশি তুলিতে চায়
কত অনুরাগে
একদিন শতবর্ষ আগে।

এই কবিতাংশ গুলিতে বা এই জাতীয় অপরাপর কবিতায় ব্যক্তি-মনের সুর নেই তা নয়, কিন্তু সে কবির একক অনুভূতির সুর নয়, সমষ্টিগত ভাবে তা হল বিশ্ব-মানবের মর্ম্ম-বাণীর প্রতিধ্বনি। সময় সময় এই অব্যক্তিকতা তাঁর বিশিষ্ট লিরিক কবিতা গুলিকে অলঙ্করণের আতিশয্যে ভারাক্রান্ত করেছে—নিছক প্রাণ-ধর্ম্মের বিচারে তাই সে সমস্ত কবিতা যথেষ্ট আন্তরিক হয়ে উঠতে পারেনি। যেমন 'উর্ব্বশী'তে—

ওই শুন দিশি দিশি তোমা লাগি কাঁদিছে ক্রন্দসী,
হে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী।
আদি যুগ পুরাতন এ জগতে ফিরিবে কি আর,
অতল অকূল হতে সিক্তকেশে উঠিবে আবার?
প্রথম সে তনুখানি দেখা দিবে প্রথম প্রভাতে,

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ

সর্ব্বাঙ্গ কাঁদিবে তব নিখিলের নয়ন আঘাতে
বারি বিন্দুপাতে।
অকস্মাৎ মহাম্বুধি অপূর্ব্ব সঙ্গীতে
রবে তরঙ্গিতে।

একজন বৈদেশিক সমালোচকের মতে, 'চিত্রাঙ্কণ ও শব্দ-যোজনার অসামান্যতা সত্ত্বেও প্রাণ-বস্তুর ব্যাপারে এই এ কবিতা অনেকটাই প্রচলিত প্রসিদ্ধির অনুসরণ। কবির স্বকীয় অনুভূতি ও আনন্দ-বেদনার প্রতিফলন এতে নেই'। বলা বাহুল্য এ মত আমরা স্বীকার করি না, তবে এই শ্রেণীর কবিতায় যে অলঙ্করণের চাতুর্য্যই বেশী এবং হৃদয়-ধর্ম্মের আবেদন যে কম তা সুনিশ্চিত। কবির অধিকাংশ প্রেম-কবিতায় এই অব্যক্তিকতা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন—

দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহিরে
মনে হল যেন চিনি,
কবে নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী।
কাজে ফেলে মোরে চলে গেছো কোন দূরে,
মনে পড়ে গেল আজি বুঝি বন্ধুরে,
ডাকিলে আবার কবেকার চেনা সুরে
বাজাইলে কিঙ্কিণী।
বিস্মরণের গোধূলি ক্ষণের
আলোতে তোমারে চিনি।

অথবা—

ক্ষমা করো তবে ক্ষমা করো মোর আয়োজনহীন পরমাদ,

ক্ষমা করো যত অপরাধ।
এই ক্ষণিকের পাতার কুটীরে
প্রদীপ-আলোকে এসো ধীরে ধীরে
বন-বেতসের বাঁশীতে পড়ুক তব নয়নের পরসাদ,
ক্ষমা করো যত অপরাধ।
আস নাই তুমি নব ফাল্গুনে ছিনু যবে তব ভরসায়,
এসো এসো ভরা বরষায়।
এসো গো গগনে আঁচল লুটায়ে,
এসো গো সকল স্বপন ছুটায়ে,
এ পরাণ ভরি যে গান বাজাবে
সে গান তোমার করো সায়—
আজি জলভরা বরষায়।

এমন কি পত্নী-বিয়োগের কবিতায়, যেখানে ব্যক্তি-মনের ছায়া পাত অনিবার্য্য ছিল, সেখানেও কবির দৃষ্টি গেছে নৈর্ব্যক্তিক বিশ্বমানবতার দিকে। যেমন—

যে-জন আজিকে ছেড়ে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।
সেই বলে গেল, গাঁথা সেরে নিয়ে একদিন
জীবনের কাঁটা বাছি,
নব-গৃহ মাঝে বহি এনো তুমি গৃহ-হীন
পূর্ণ মালিকা গাছি।

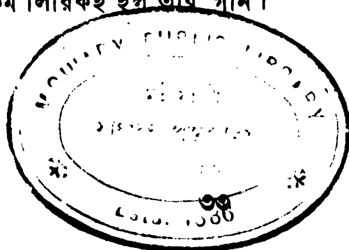
'স্মরণে'র দু-একটি কবিতায় অবশ্য আত্মকেন্দ্রিকতার রেশ যে না পাওয়া যায় এমন নয়, কিন্তু তার পরিমাণ কম। মরণ-মহোৎসবের মধ্যে দিয়ে প্রিয়ার নব জন্মান্তর প্রাপ্তি এবং বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে অমর প্রাণ-লক্ষ্মী রূপে তাঁর প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই কবিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বাস্তব শোকের উর্দ্ধে। তাই এই সব শোক-কবিতায় শোকের প্রত্যক্ষ রূপ নেই, আছে তারি রসায়িত ব্যখ্যান। যে দু-একটি কবিতার কথা বলেছি, তার একটি থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

তোমার বাহু কত না দিন শ্রান্তি-দুখ ভুলিয়া
গিয়েছে সেবা করি,
আজিকে তারে সকল তার কর্ম্ম হতে তুলিয়া
রাখিব শিরে ধরি।
এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মন-প্রাণ,
এখন হতে আমার পূজা লহগো আঁখি-সলিলে
আমার স্তব-গান।

এখানে বলে রাখা দরকার যে ইউরোপীয় আদর্শে যে-শ্রেণীর আত্ম-কেন্দ্রিক লিরিক আমরা পড়তে অভ্যস্ত, সেই দিক থেকে বিচার করেই এই সমস্ত কবিতার অব্যক্তিকতাকে আমরা অপূর্ণতা রূপে গণ্য করেছি। নতুবা রসাত্মক কবিতা হিসেবে এদের অপূর্ব্বতা, বিচিত্রতা, শব্দ-প্রয়োগের অসামান্যতা কারুরই দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়। ব্রাউনিঙের তীব্র ভাবাবেগ বা শেলীর আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে যে লিরিক জন্মেছে, রবীন্দ্র-লিরিকে তার নিদর্শন নেই এমন নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রধানত এবং প্রথমত লোকত্তর রসের কবি, তাই লৌকিক পরিবেশের যে সমস্ত

সুখ-দুঃখ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অনতিক্রম্য, তাকে তিনি স্বপ্নের রসায়নে রঞ্জিত বা তত্ত্বের পুটপাকে শোধিত করেই উপস্থাপিত করেছেন। এ একটা নূতন আদর্শ সন্দেহ নেই।

কবির গীত-সাহিত্য সম্বন্ধে পৃথক আলোচনা করাই হয়ত সমীচীন হত, কিন্তু যেহেতু তাঁর গীত-সাহিত্যকে সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করলে সম্পূর্ণ জাতের কবিতা রূপেই নেওয়া যায়, সেই জন্যেই আমরা তাকে কাব্য-শাখার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছি। সুরে গেয় গান রবীন্দ্রনাথ জীবনে তিন হাজারের ওপর লিখেছেন—তাতে স্বদেশী গান আছে, ভগবৎ বিষয়ক গান আছে, প্রকৃতি-সঙ্গীত আছে, প্রেম-সঙ্গীতের ত সীমা-সংখ্যাই নেই। বিভিন্ন ঋতুতে প্রকৃতির রূপান্তর, বিভিন্ন অবস্থায় মনের ভাবান্তর এবং তারি পরিপূরক রূপে নব নব সুর, নব নব রসের অজস্র গান তিনি বিতরণ করে গেছেন দেশের হাতে সমস্ত জীবন ধরে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুরকারদের মধ্যেও বৈচিত্র্য, পরিমাণে এবং উৎকর্ষে সঙ্গীত-রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের আসন নিঃসংশয়িত রূপে সর্ব্বোচ্চ। তাঁর কবিতায় সময় সময় অতি-বিস্তৃতি দেখা যায়, সময় সময় দেখা যায় অনান্তরিক উক্তিকে অলঙ্কারের জড়োয়া গহনা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার বাহুল্য, সময় সময় আবার তত্ত্বের ভারে বিপর্য্যস্ত করে ফেলতেও দেখা যায়। কিন্তু তাঁর গান প্রায় সর্ব্বত্রই আন্তরিক, সর্ব্বত্রই মর্ম্মাভিমুখী, আর রূপে-রসে সর্ব্বত্রই অনবদ্য। রবীন্দ্র-নাথের শ্রেষ্ঠতম লিরিকই হল তাঁর গান।



নাটক

বাংলা দেশে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যে নাটকের সাফল্য পরীক্ষিত না হয়, সাধারণ্যে তার সমাদর হয় না। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্য এদেশে তেমন করে আদৃত হয়নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃজনী-প্রতিভার একটি বৃহৎ অংশই রূপ পেয়েছে তাঁর নাট্য-সাহিত্যে। প্রথম যৌবন থেকে সুরু করে, একেবারে শেষ বয়স পর্যন্ত তিনি অল্পাধিক কুড়িখানা নাটক লিখেছেন। দু-এক খানি ছাড়া তাঁর কোন নাটকই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে যোগ্য সমাদর লাভ করেনি, কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ যে নানা ভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, একথা প্রত্যেক রসিক পাঠকই স্বীকার করবেন।

কবির বহু বিস্তৃত নাট্য সাহিত্যকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম ভাগে দ্বন্দ্ব নাট্য—যথা, 'প্রকৃতির প্রতি-শোধ', 'রাজা ও রাণী', 'চিত্রাঙ্গদা', 'নটীর পূজা'। দ্বিতীয় ভাগে রঙ্গনাট্য—যথা, 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ' ('শেষ রক্ষা'), 'শোধ বোধ', 'মুক্তির উপায়'। তৃতীয় ভাগে রূপক নাট্য—যথা, 'রক্ত-করবী', 'ডাকঘর', 'ফাল্গুনী', 'রাজা', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা'। চতুর্থ ভাগে গীতিনাট্য ও নৃত্য নাট্য—যথা, 'বাল্মিকী প্রতিভা', 'মায়ার খেলা', 'ঋতু উৎসব' ইত্যাদি এবং 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'তাসের দেশ' প্রভৃতি। এর মধ্যে 'নটীর পূজা' ভিন্ন সমস্ত দ্বন্দ্ব নাট্যই এবং 'মুক্তির উপায়' ছাড়া সমস্ত রঙ্গনাট্যই কবির যৌবনের লেখা। রূপক

নাট্যের সবগুলিই লেখা তাঁর পঞ্চাশ বৎসরের পরে। আর গীতি-নাট্যের মধ্যে 'বাল্মীকি-প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' প্রথম যৌবনের, ঋতু উৎসবগুলি প্রৌঢ় বয়সের এবং নৃত্য-নাট্যগুলি সমস্তই পূর্ণ বার্দ্ধক্যের রচনা। এছাড়া 'কাহিনী' গ্রন্থের 'কর্ণকুন্তী সংবাদ', 'গান্ধারীর আবে-দন', 'নরকবাস, 'সতী' প্রভৃতি নাট্য-কবিতা এবং 'বিদায় অভিশাপ', 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' আছে—আর আছে 'ব্যঙ্গ কৌতুকে'র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহসন-গুলি। সব শুদ্ধ জড়িয়ে এই হল রবীন্দ্রনাথের নাট্য সাহিত্য। কবিতা, গান ও গদ্য রচনার তুলনায় যদিও নাট্য-রচনা তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার একটি গৌণ দিক মাত্র, তবু এদিকেও তাঁর সৃষ্টির বিস্তৃতি ও অভিনবতা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর লেখকের অনুরূপ।

সর্ব্বপ্রথম কয়েকখানি ট্র্যাজেডির প্রতিপাদ্য বস্তু নিয়ে অল্প একটু আলোচনা করে দেখাই।

চিরাচরিত ধর্ম্মবিশ্বাসের ওপর সন্দেহাকুল প্রশ্নের আবির্ভাবে বিসর্জ্জনের যে ট্র্যাজেডি বা রূপ-যৌবনের অচির মদিরায় আত্মবিস্মৃত প্রেমের স্বপ্নভঙ্গে চিত্রাঙ্গদার যে ট্র্যাজেডি, অনন্যনির্ভরশীল দাম্পত্য-বন্ধনের মধ্যে নারীর ব্যক্তিত্ববোধের জাগরণে রাজা ও রাণীর যে ট্র্যাজেডি বা সন্ন্যাসের আপাত-কঠোরতার অন্তরালে মানবিক হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের সহসা উদ্ভবে প্রকৃতির প্রতিশোধের যে ট্র্যাজেডি—তা হল ভাবের ট্র্যাজেডি। বাইরের সমস্ত ব্যবস্থাকে অব্যাহত রেখে অন্তরে সময়-সময় কি বিপর্য্যয়ের ঝড় উঠতে পারে এবং সেই ভাঙনের আঘাতে মানুষের জীবন-ধারায় যে কি শোচনীয় ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, তাঁর ট্র্যাজেডিগুলিতে তার আভাষ পাওয়া যায়। এদের দ্বন্দ্ব বহিরঙ্গিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব নয়, এদের

দ্বন্দ্ব আদর্শের সঙ্গে আদর্শের দ্বন্দ্ব, ভাবের সঙ্গে ভাবের দ্বন্দ্ব। তাই এদের ট্র্যাজেডি বাইরের খুনোখুনি বা রক্তারক্তির অপেক্ষা রাখে না—বাইরে অনেক সময় একটি দীর্ঘশ্বাসেরও অবকাশ থাকে না, অথচ নিঃশব্দ ভূমিকম্পে হৃদ-জগৎ চুরমার হয়ে যায়।

জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে মানুষের অবিবেচনা প্রসূত ভুল চাল বা অন্যায়পণা তাকে ও তার আবেষ্টনীকে কি ভাবে রূপান্তরিত করে, তিনি তাই অঙ্কিত করেছেন তাঁর ট্র্যাজেডিতে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁর ট্র্যাজেডিতে অনেকটা যন্ত্রবদ্ধ, অনেকটাই প্রাকব্যবস্থিত। হঠাৎ একটা দীর্ঘদিন পোষিত ফাঁকি ধরা পড়ে যাওয়া বা একটা নিষ্ঠুর সত্য নিরাবরণ হয়ে যাওয়া বা এই রকম একটা আকস্মিক ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করেই তাঁর ট্র্যাজেডিতে দ্বন্দ্ব সুরু হয়—তারপর বিশ্বমানবের মনোবৃত্তির একটা-না-একটা পর্য্যায়ের সঙ্গে বিপরীতমুখী একটা-না-একটা শক্তির সংঘর্ষ নিয়েই দ্বন্দ্ব জমে ওঠে। বিসর্জ্জন নাটকে জয়সিংহের মৃত্যুর একটা ঘটনা আছে বটে, কিন্তু ওর ট্র্যাজেডি ওতেই নয়। আধ্যাত্মিক প্রভুত্বের সঙ্গে রাষ্ট্রিক প্রভুত্বের যে বিরোধ, তারই শোচনীয় পরিণতিতে হল ওর ট্র্যাজেডি—জয়সিংহ তাতে একটা বুদ্বুদ, অপর্ণা আর একটা, এবং রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্য পরস্পরবিরোধী ভাবের প্রতীক রূপে আরও দুটি বুদ্বুদ। রাজা ও রাণীর বা প্রকৃতির প্রতিশোধের মর্ম্মকথা নিয়েও এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। এখানে বলে রাখা দরকার যে এগুলি নাটকাকারে লেখা হলেও কাব্য-ধর্ম্মের প্রাবল্য এদের নাটকীয় সংস্থানকে পদেপদেই ক্ষুণ্ণ করেছে। চিত্রাঙ্গদার যৌবন ও রূপ-লাবণ্য অপগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অর্জ্জুনের স্বপ্নভঙ্গ হওয়া এবং তা থেকে উভয়ের দাম্পত্য-বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার

ভেতর দিয়ে মূলে একটি তত্ত্বই রূপারিত হয়েছে—তার এক দিকে অর্জুন, অন্য দিকে চিত্রাঙ্গদা। এই সব নাট্যকাব্যের পাত্র-পাত্রীরা সকলেই অল্পবিস্তর নৈর্ব্যক্তিক—তারা চিন্তাসমষ্টির এক-একটি নিরুপাধিক প্রতিভূ স্বরূপ। অর্থাৎ তারা স্ব স্ব রূপে আত্মস্বতন্ত্র চরিত্র নয়, তাদের সকলেরই সত্তার মূল নিবদ্ধ কবির subjective মনে, তারা কেউ তাঁর ভাব-দ্বন্দ্বের এ-দিক, কেউ বা ও-দিক। তাদের পরিভ্রমণ শুধু কবিকে কেন্দ্র করে, দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে নয়। সেই জন্যেই খাঁটি জাতের নাটক না বলে আমরা এগুলিকে নাট্যকাব্য আখ্যা দিয়েছি। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যরচনাবলী প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য রূপে গৃহীত হয়েছে, তার কারণ এদের দৃষ্টি-ভঙ্গী ও লিখন-পদ্ধতিতে সেই সত্যকার শিল্পীক উৎকর্ষ দেখা যায়, যা স্থায়ী সাহিত্যের কুল-লক্ষণ।

কমেডিতে কবির নাটকীয় বৈশিষ্ট্য আরো অতুলনীয়। কবির কমেডি গুলিতে কোন গুরুভার সমস্যা নেই, কোন তত্ত্ব তথ্য নেই। বাস্তব সংসার থেকে চয়ন করে কবি এমন কতকগুলি নর-নারীকে আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন, যারা নিতান্তই চেনা মানুষ। বৈকুণ্ঠের খাতার বৈকুণ্ঠ, গোড়ায় গলদের গদাই, চিরকুমার সভার অক্ষয়—কেউই কোন বাণীর বাহক নয়, অথবা বিশ্বমানবের প্রতিনিধি নয়, তারা স্ব স্ব খেয়াল, সংস্কার ও অভ্যাস নিয়ে সম্পূর্ণ এক-একটি মজার মানুষ। তাদের কথা-বার্ত্তা, কাজ-কর্ম্ম, ভঙ্গী-রঙ্গি, সমস্তই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমি থেকে আহৃত, যদিও প্রাত্যহিকতার মালিন্য নেই তাদের। তারা নিজেদের দুঃখ-সুখের টানা-পোড়নে নাটকীয় পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে—নিজেরা তারা জানেও না অন্যকে তারা কি ভাবে হাসাচ্ছে। জেনে হাসালে নাটক হত না, হত ফার্স। তাদের

চরিত্রের মূলসূত্রগুলি পাঠকের চোখে উদ্‌ঘাটন করেই কবি আড়াল থেকে বাজিকরের মতো তাদের নাচিয়ে গেছেন, অনেকটা মলেয়ার বা শেরিডানের মতো। ঘটনার স্রোতে তারা ছুটে চলেছে, আমরা সেই চলমান জীবন-স্রোতের ভেতর দিয়েই তাদের চারিত্রিক বিশেষত্বগুলো চিনে নিই এবং কৌতুক পাই। কবি চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের তা দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি কোথাও, যা সস্তা দরের কমিক লিখিয়ে প্রায়ই করে থাকেন। অবশ্য চিরকুমার সভার হাস্যরস সময় সময় চরিত্র বা ঘটনাকে ছেড়ে কেবলমাত্র শব্দকে ভর করে এবং সেখানে প্রয়োজনের চেয়ে প্রয়াসটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু গোড়ায় গলদ বা বৈকুণ্ঠের খাতা, বিশেষত বৈকুণ্ঠের খাতা মার্জ্জিত, শিষ্ট হাস্যরসের আদর্শ রচনা। হয়ত ওদের সুর একটু বেশী সূক্ষ্ম, মোটা কানের পক্ষে পরিমিত। সেই জন্যেই বোধ করি মঞ্চে এরা খুব বেশী জমে না।

কিন্তু কবির তৃতীয় পর্য্যায়ের নাট্য গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অনেকের অনেক রকম অভিমত। কেউ কেউ এগুলিকেই কবির সর্ব্বোত্তম রচনা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর রূপক নাট্যগুলি আমরা ভালো রকম বুঝে উঠতে পারিনি। 'রাজা', 'রক্তকরবী', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর' প্রভৃতি পড়তে খুবই ভালো লাগে—এদের শাণিত তরবারির কসরতের মতো উজ্জ্বল কথার খেলা চমক লাগায়। কিন্তু মনে হয়, রূপকের গহনে ওদের আখ্যানাংশের সূতায় মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জোট পাকিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্য্যন্ত রূপকের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকছে না, রূপকে ও প্রত্যক্ষে মেলামেশা হয়ে যাচ্ছে—চরিত্রগুলো হচ্ছে পুরোপুরি অবাস্তব, আখ্যাংশ শ্লথগতি এবং প্রতিপাদ্য দুর্নিরীক্ষ্য। যে কোন সিদ্ধান্ত খাড়া করেই ওদের ওপর আরোপ করা হয়ে থাকে এবং অনেক গূঢ় রহস্যেরও

আভাষ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে যা ধরা পড়ে না, তা খুঁজে বের করে রসোপলব্ধি সম্ভব নয় নিশ্চয়ই। অর্থাৎ কবির এই পর্য্যায়ের নাটক সর্ব্বসাধারণের জন্যে নয়। ওদের প্রাণ-বস্তু পর্য্যালোচনা করে আমরা কোন ধারাবাহিক বক্তব্যের হদিশ পাইনা। মেটারলিঙ্কের পদ্ধতিতে কবি এই নাটকগুলো লিখেছিলেন শুনেছি। মেটারলিঙ্কের সাধারণ নাটকগুলির বিশেষ আনন্দের সঙ্গেই পড়া যায়, কিন্তু তাঁর সিম্বলিক নাটক বেশীর ভাগ পাঠকেরই বোধগম্য হয়নি। সিম্বলিজম বা যে-কোন ইজমই থাক তাদের ভেতর, তা মোটেই সহজবোধ্য নয়। স্বয়ং টলষ্টয়ই তাদের অর্থ বের করতে হয়রাণ গিয়ে হয়ে শেষে অর্থহীন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রূপক-নাট্য সম্বন্ধেও আমরা অনুরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেই ক্ষান্ত হতে চাই। অবশ্য একথা আবার বলা দরকার যে বইগুলি পড়তে খুবই চমৎকার লাগে—কেমন একটা আবছা আবছা ব্যঞ্জনা, সব কিছুর সমবায়ে কেমন একটা অন্তর্গূঢ় লিরিক-স্বপ্নের মতো লাগে এই নাটিকা গুলোকে।

তাঁর বার্দ্ধক্যের উল্লেখযোগ্য নাটক হল 'তপতী' আর 'বাঁশরী'—এর মধ্যে তপতী পুরানো 'রাজা ও রাণী'র পুনর্লিখন এবং 'রাজা ও রাণী'র কাব্যাত্মকতা এই নব রূপান্তরে খানিকটা নাটকীয় বৈশিষ্ট্যই লাভ করেছে। 'বাশরী' ধারালো কথাবার্ত্তায় 'শেষের কবিতা' উপন্যাসের জাত-ভাই—কিন্তু সাম্প্রতিক কালের কয়েকটা নির্দ্দিষ্ট টাইপ নিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে এতে বিদ্রূপ করা হয়েছে মাত্র, তাদের ভেতর দিয়ে অবিচ্ছিন্ন একটি ঘটনার পটভূমি গড়ে ওঠেনি। কবির লেখনী যে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল, এই বই দুটিতে তা বিশেষ ভাবেই বোঝা যায়।

কবির সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ের নাট্য-সাহিত্য নিয়ে বেশী কিছু বলার

নেই। 'মায়ার খেলা' বা 'ঋতু উৎসব' আসলে গানের সংগ্রহ, নাটকের কাঠামো ওদের গানের মালায় সুতোর মতো থেকে, এক-একটা ঘটনার বা ব্যঞ্জনার ভেতর দিয়ে ওদের টেনে নিয়ে গিয়েছে। নিছক নাটক হিসাবে ওদের কোন দাবী নেই—ওরা দাবী করে কাব্য হিসাবেই। আর নৃত্য-নাট্যগুলি হল আসলে নৃত্যের পালা। তার মূক আভিনয়িক আবেদনকে দর্শকের মনের চোখে ফুটিয়ে তোলার জন্যেই লেখা হয়েছে ওর গানগুলি—যা কথাবার্ত্তার মতোই স্বচ্ছন্দ, অথচ সুরসংবদ্ধ। এ জিনিষ বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং আমাদের রঙ্গালয়ের এক-ঘেঁয়েমি দূর করার দিক থেকে এ সৃষ্টির মূল্য বড কম নয়। রবীন্দ্র-নাথের লেখনী যে নিত্য কত নূতন পথ প্রবাহিত হত, শেষ ক'বৎসরের এই নৃত্য-নাট্য রচনা থেকেও তা প্রমাণিত হয়।

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' যখন ধারাবাহিক ভাবে 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় বের হতে থাকে, তখন কবির বয়স বড় জোর ষোল-সতেরো। এই বইটিকে কবি শেষও করেন নি, পরে পুস্তকাকারে প্রকাশও করেন নি। এর কয়েক বৎসর পরে তিনি 'ভারতী'তেই লেখা সুরু করেন 'বৌঠাকুরাণীর হাট'—এইটিই তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। 'রাজর্ষি' হল এর পরবর্ত্তী বই। 'নৌকা ডুবি' এবং 'চোখের বালি' তাঁর যৌবনের রচনা—প্রৌঢ় বয়সে তিনি লেখেন 'গোরা', 'সবুজপত্রে'র আমলে 'ঘরে-বাইরে' ও 'চতুরঙ্গ' এবং পূর্ণ বার্দ্ধক্যের রচনা হল 'শেষের কবিতা' ও 'যোগাযোগ'। 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ' ও 'দুই বোন' উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁর সর্ব্বশেষ দান। 'নষ্টনীড়' 'গল্পগুচ্ছে'র অন্তর্ভুক্ত রূপে প্রকাশিত হলেও, তা-ও আসলে একটি উপন্যাস—বরং সে হিসাবে 'দুই বোন', 'মালঞ্চ' প্রভৃতিই বড় গল্প। মোটের ওপর এই হল রবীন্দ্র উপন্যাস-সাহিত্য।

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রে এলে, আমরা বাংলা উপন্যাসের ক্রম-পরিণতির একটি সমগ্র ইতিহাস পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাংলা ভাষায় যা উপন্যাস হয়েছে, তা খাঁটি জাতের সাহিত্য নয়। বঙ্কিমই প্রথম সত্যিকার সাহিত্যিক উপন্যাস লেখেন এবং নিজে যা লেখেন, তার চেয়ে অনেক বেশী পথ প্রস্তুত করে দিয়ে যান পরবর্ত্তী কালের লেখকদের জন্যে। রবীন্দ্রনাথে বঙ্কিম-সাহিত্যের সে

সম্ভাবনীয়তা পরিপূর্ণ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমের রচনা-ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। মধ্য বয়সে তিনি দৃষ্টি ও মনন-রীতির গভীরতায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে যান অনেক দূরে এবং শেষ জীবনে বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তন করে বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম প্রজ্ঞামূলক উপন্যাসের সূত্রপাত করেন।

ক্রমপরিণতি বোঝাবার জন্যে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যকে আমরা মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম ভাগের 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাসে কবির প্রধান উপজীব্য হল গল্প বলা। সেই গল্পকে মনোজ্ঞ করে বলার জন্যে তিনি যে আবহাওয়ার সৃষ্টি ও অন্তর্দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন, তাতে শিল্পীক কৃতিত্ব বিশেষ ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে, তবু অভিনিবেশ নিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে এই রচনাগুলিতে কবি সম্পূর্ণরূপে তাঁর মৌলিক পদ্ধতিটির সন্ধান পান নি—তিনি বঙ্কিমের কাঠামো অনুসরণ করেই লিখেছেন বইগুলি। অর্থাৎ এই বইগুলির ভেতর রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনুরূপ সূক্ষ্ম মননশীলতা ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় ততটা পাওয়া যায় না, যেমন পাওয়া যায়, রচনার গাল্পিক কৌতূহলকে ঘটনার পর ঘটনা দিয়ে চমকপ্রদ করে গড়ে তোলার কৌশলটি। এই বহির্মুখিতা ও গতানুগতিকতা যে তাঁর বইগুলির পক্ষে কিছুটা অসার্থক হয়েছে, কবি নিজেই তা টের পেয়েছিলেন—তাই পরে তিনি 'রাজর্ষি'র বিষয়-বস্তু নিয়ে 'বিসর্জ্জন', এবং 'বৌঠাকুরাণীর হাটে'র বিষয়-বস্তু নিয়ে 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক লিখে প্রকারান্তরে এদের অস্বীকারই করেছিলেন। 'নৌকাডুবি' বইটি সম্বন্ধে তাঁর মমতা ছিল—সংগৃহীত রবীন্দ্র রচনাবলীতে এই বইটি সম্বন্ধে তিনি নূতন করে একটি ভূমিকা সংযোজিত করেন এবং

তাতে যে-মনস্তত্ত্ব সম্মত আদর্শে আজ উপন্যাস লেখা হয়ে থাকে, নৌকাডুবি যে কেন তার অনুসরণে লিখিত হয়নি, তার তিনি একটি কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। বলা বাহুল্য সে কৈফিয়ৎ মূলত বঙ্কিমানুগমন। তবে একথা সুনিশ্চিত যে নৌকাডুবিই ঘটনা, চরিত্র ও বিন্যাসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বপ্রথম বিশিষ্ট উপন্যাস, যার ভূমিকা মাত্র দেখা যায় 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' বা 'রাজর্ষিতে'। বোধহয় সেই জন্যেই কবি এই বইটিকে তাঁর উপন্যাস সাহিত্যের Land-Mark হিসাবে গণ্য করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগের সুরু 'চোখের বালি'তে এবং 'গোরা'তে তার সম্পূর্ণতা। নিছক গল্প বলা পরিহার করে কবি এখন থেকে এলেন সমস্যা বিচারে, এবং এই থেকেই বাংলা উপন্যাসের রাজ্যে এলো বিশ্লেষণমুখিতা। সমস্যায় বঙ্কিমচন্দ্রও হাত দিয়েছিলেন এবং 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা নিয়েছিলেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি সেই সমস্যারই সূত্রপাত করেছিলেন। কিন্তু সমস্যাকে বাস্তবের সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করা এবং কোন সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা পরিণতির নির্দ্দেশ দেওয়া বঙ্কিমের দ্বারা সম্ভব হয়নি, তার কারণ বঙ্কিম জীবনকে দেখেছিলেন প্রচলিত নীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার আজ্ঞাবহ রূপে। তিনি দেখেছিলেন, বালবিধবা রোহিনীর স্বাভাবিক নিয়মেই পদস্খলন হয়েছে, কিন্তু তাকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি, এমন কি সহানুভূতি দেখাতেও তাঁর আপত্তির অন্ত ছিল না। শিল্প-সৃষ্টি করতে বসেও তিনি ভুলতে পারেন নি যে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থিত সমাজ-শৃঙ্খলার রক্ষণাবেক্ষণ ভার তাঁর হাতে ন্যস্ত। অর্থাৎ তিনি বাস্তবের আলোকে জীবনকে দেখেন নি, মনস্তত্ত্ব সম্মত পথে তার বিচারও করেন নি।

রবীন্দ্রনাথই প্রথম সেই সংসাহস দেখালেন বিনোদিনীকে চিত্রিত করে। 'গোরা'তে তিনি জাতীয়তা বোধের স্বরূপ নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন—এতে তিনি দেখিয়েছেন যে যে-বিবেচনাহীন সংস্কারের অন্ধতায় আমরা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তা নিয়ে মাতামাতি করি, অনেক সময়ই তার পিছনের বনিয়াদটার খবর আমাদের জানা থাকে না। আমরা কি ও কে, সেই খবর আমরা জানি না বলেই আমরা পরজাতি-বিদ্বেষের বাঁকা পথে স্বজাতির মুক্তি খুঁজতে বের হই। বাস্তবের অবস্থা-সজ্ঘাতে যদি কোন দিন আকস্মিক ভাবেই বেরিয়ে পড়ে সেই রূঢ় সত্যের কঙ্কালটি, তাহলে সেদিন আমরা বিশ্বমানবতার মধ্যেই জাতীয়তাকে ডুবিয়ে না দিয়ে পারিনা। 'আনন্দ মঠে'র আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়াতেই বোধহয় কবি লেখেন 'গোরা', যেমন 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রতিবাদেই লেখেন 'চোখের বালি'। প্রকৃতপক্ষে এই দুটিই হল রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপন্যাস। 'নষ্টনীড়ে' বা 'চতুরঙ্গে' তাঁর অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর সূক্ষ্ম—অন্তঃপ্রবাহী মনস্তত্ত্বের আঘাত-সজ্ঘাতে ওদের ঘটনা ও চরিত্র অনেক বেশী সাবলীল গতিতে অগ্রসর হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে'তে পরস্পরবিরোধী আদর্শের সজ্ঘাতে জীবনের গতি ও প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়েছে অনেক বেশী গভীর ভাবে। তা সত্ত্বেও এ গুলির ভেতর ঠিক সেই জাতের সম্পূর্ণতা নেই, বাস্তব পরিপ্রেক্ষণীর ভেতর থেকে বিচিত্র জীবন-ধারাকে অনুগমন করা ও তাকে পরস্পরের প্রতিকূলে উপস্থাপিত করে সুস্পষ্ট এক-একটি জীবনাদর্শের নির্দ্দেশ দেওয়ার সেই সর্ব্বাঙ্গীনতা নেই, যা আছে 'চোখের বালি' ও 'গোরা'য়।

তৃতীয় ভাগের আরম্ভ 'ঘরে-বাইরে'তে এবং 'চার অধ্যায়' পর্য্যন্ত চলেছে তারই জের। শুধু মাঝখানে 'শেষের কবিতা' একটি স্বয়ং-

সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। কয়েকটি বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক নর-নারীর চটুল ও বাস্তব-সম্পর্কহীন জীবন নিয়ে কৌতুক করার উদ্দেশ্যেই কবি লিখেছেন এই রোমান্সখানি, এবং শিলং-এর পার্ব্বত্য পটভূমিতে হাস্যে-লাস্যে কাব্যে-গানে এর খামখেয়ালী চরিত্রগুলো উৎসারিত হয়েছে এক-একটি কবিতার মতো। সমাজ-জীবনের যে স্তরকে কবি লক্ষ্য করেছেন এই বইয়ে, 'বাঁশরী' নাটকেও তিনি এঁকেছেন তাদেরই—কিন্তু 'বাঁশরী'তে তাঁর বিদ্রূপের সুর তীক্ষ্ণ, 'শেষের কবিতা'য় তা মন্দীভূত, রোমান্সের মদিরায় আচ্ছন্ন। কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্ট এই সমস্ত অমিত ও লাবণ্যেরা তাঁর সহানুভূতির ওপর চড়াও করে বসেছে, যার ফলে এই শ্রেণীর বাস্তববিমুখ আইডিয়া-সর্ব্বস্ব নর-নারীর জীবন যে পরিণতির সম্মুখীন হওয়া উচিত হত, তা হয়নি। শাণিত কথার কসরতে এবং অনুপম কাব্য-বিহ্বলতায় এর নর-নারীরা উপভোগ্য, এবং সেই দিক থেকেই শেষের কবিতার মূল্য। তার অধিক এ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করা চলে না।

তৃতীয় পর্ব্বে এসে রবীন্দ্রনাথ কথা-সাহিত্যের প্রচলিত প্রসিদ্ধি গুলোকে প্রায় সমস্তই এড়িয়ে গেছেন। কি গল্প বলায়, আর কি মনস্তত্ত্ব বিচারে, কোনদিনই এখন থেকে তাঁর আর বিশেষ আস্থা দেখা যায় না। এই পর্ব্বে তিনি প্রধানত আশ্রয় করেছেন তত্ত্বকে এবং তত্ত্বের বাহন-রূপেই আসরে নামিয়েছেন নর-নারীকে। 'ঘরে-বাইরে', 'চার অধ্যায়', 'দুইবোন', মালঞ্চ'—কোনটাই এদিক থেকে বিশুদ্ধ জাতের উপন্যাস নয়। এই পর্ব্বের 'যোগাযোগে' তাঁকে আর একবার অবশ্য পাওয়া গেছে পূর্ণাঙ্গ ঔপন্যাসিক রূপে—এই বইটিতে পর্য্যবেক্ষণ, ঘটনা সমাবেশ, চরিত্র-চিত্রণ সর্ব্বত্রই পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর লেখনীর নৈপুণ্য—তবু এ

হল তাঁর সাহিত্যের নাবী ফসল, এখানে তাঁর সৃজনী-প্রতিভায় সেই বেগ ও বিস্তার আর তেমন করে দেখা যায় না।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই তিন পর্ব্ব নিয়ে সমগ্রভাবে আলোচনা করলে মোটা কথা এই দাঁড়ায় যে বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত ধারার অনুসরণ করে কবি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বকীয় দৃষ্টি, চিন্তা ও মননশীলতার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে ধীরে ধীরে তা তার নিজস্ব পরিণতিতে এসে উপনীত হয়েছে। এই পরিণতির স্বরূপ যদিও এত কম পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয়, তবু সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাস্তব বরাবরই থেকেছে পশ্চাৎপট রূপে, আর প্রত্যক্ষে যা ফুটেছে সে হল কবির ব্যক্তি-মনের ছায়া। তিনি যে নর-নারীদের অবতারণা করেছেন তাঁর উপন্যাসে, তারা পূরোপূরি রক্তমাংসের মানুষ কেউই নয়, তারা হচ্ছে এক-একটি মানবায়িত ভাব। পরস্পর-বিরোধী ভাবের সঙ্ঘাতে রবীন্দ্র-উপন্যাসে তাই যে দ্বন্দ্ব তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, তা বস্তু-সংসারের জীবন-দ্বন্দ্ব নয়।

আধুনিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় যে প্রাবন্ধিক উপন্যাসের রীতি নিয়ে পরীক্ষা চলছে, 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে' প্রভৃতি বইয়ে রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা ভাষায় তার প্রবর্ত্তন করেন। নিছক উপন্যাস ঠিক নৌকাডুবিও নয়, এই দুটি বইও নয়, শেষের কবিতাও নয়। বরং নষ্টনীড় ও চতুরঙ্গে খাটি জাতের উপন্যাসের বীজ নিহিত আছে, যা স্বল্প পরিসরে গল্পাকারে সংহত করায় সমগ্র হয়ে রূপ নিতে পারে নি মোটের ওপর উপন্যাস-সাহিত্যের প্রচলিত প্রায় সমস্ত আদর্শ নিয়েই কবি পরীক্ষা করেছেন এবং আত্মস্বতন্ত্র ভাবে প্রত্যেকটি পরীক্ষাই তাঁর হাতে সাফল্য লাভ করেছে, যদিও তথাকথিত প্রাবন্ধিক উপন্যাসেই তাঁর

লেখনী খুলেছে সব চেয়ে বেশী। এই নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান। শরৎচন্দ্র থেকে আধুনিক কালের বিশিষ্ট উপন্যাসকাররা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যে যুক্তিসিদ্ধতা ও মননশীল আধুনিকতা ইদানীন্তন সমালোচনায় উচ্চ প্রশংসার সঙ্গে সম্বর্দ্ধিত হয়, তার পেছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই আদর্শ। আধুনিক বাংলা উপন্যাসে বস্তু-সংসারের বা বাস্তব নর-নারীর স্বরূপ অনেকটাই প্রচ্ছন্ন। তাদের কেন্দ্র করে প্রধানত ফুটে ওঠে রচয়িতার নিজস্ব মননশীলতায় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে তিনি সেইটাকেই যাচিয়ে বাজিয়ে নেন। এই জন্যে এখনকার উপন্যাসে গল্পের পরিসর যেমন ছোট, চরিত্রের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যও তেমনি সংহত। দোষের বা গুণের কথা না তুলেও বলা যেতে পারে যে এ একটি পদ্ধতি, যা এখনো পরীক্ষাধীন। রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষায় এর সূচনা করেছেন এবং তাঁর হাতেই এর পরিপূর্ণতা।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই বাস্তবিকতা শরৎচন্দ্রে এসে কতকটা বাস্তবানুগামী হয়েছে—বিষয় ও বিন্যাস দু'দিকে থেকেই তিনি যথাসম্ভব বস্তুকে আশ্রয় করে উপন্যাসে রস-সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মৌলিক প্রেরণা এবং তাকে শিল্পে রূপায়িত করবার বাহন তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকেই পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পাত্র-পাত্রীদের মতো তাঁর চরিত্রগুলি বিশ্বমানবের প্রতিনিধি নয়, দেশ-কালের অতীত সুমহান জীবন-ধর্ম্মকে আশ্রয় করেও তারা চলে না, কিন্তু যে লৌকিক ব্যঞ্জনায় তারা পরিস্ফুট হয়েছে, তা মোটের ওপর রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী।

রবীন্দ্রনাথে বাস্তব মানুষ নেই, এ কথা আগেই বলেছি, তবু যাদের তিনি মানুষ করে আসরে নামিয়েছেন, তারা সবাই সমাজ-সৌধের

উঁচুতলার বাসিন্দা। বঙ্কিমের রাজা, জমিদার, নাইট ও সন্ন্যাসীদের পর তারা স্পষ্ট ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই, কিন্তু সাম্প্রতিক কালের আগে আমরা নিম্নবিত্ত গৃহস্থ বাঙালীর চিত্র তেমন করে সাহিত্যে দেখিনি, এক দীনবন্ধুতে ছাড়া। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্যে সমাজ-জীবনের এই পর্য্যায়টির পরিচয় প্রচ্ছন্ন। এর কারণও সুস্পষ্ট। ভারতে বৈদেশিক শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসেছিল বৈদেশিক শিক্ষা ও ব্যবসা, আর এ দুইয়ের আকর্ষণে সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অল্প সংখ্যক লোক এসেছিল নগরে—শিক্ষায়-দীক্ষায় কাজে-কারবারে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিয়ে বৈদেশিক প্রভুত্বের পরিপূরক আত্মস্বতন্ত্র একটি সম্প্রদায় রূপেই গড়ে উঠেছিল তারা। এক পুরুষ পরে দেশের গণ-জীবন থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে, এরাই হয়ে পড়লো বাংলা দেশের তথাকথিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—এরাই এ দেশে, সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি এক কথায় আধুনিক সংস্কৃতি গড়েছিল, তাই তার ভেতর স্থান হল না হীনবিত্ত কৃষক বা বৃত্তিজীবীপল্লীবাসীর। আর এক পুরুষ পরে ক্রমবর্দ্ধমান নাগরিকতার সঙ্গে ধনোৎপাদনের পরিমাণ অনুপাত রক্ষা করে চলতে না পারায়, সহরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে ঢুকলো ভাঙন—বেকার সমস্যা ও অবিবাহে বিপর্য্যস্ত হয়ে তার এক বৃহৎ অংশ দ্রুতগতিতে নেমে যেতে লাগলো গণ-জীবনের দিকে। এই হীনবিত্ত সহুরেরা শিক্ষিত, কাজেই বৃত্তিজীবী পল্লীবাসীর সঙ্গে এদের নাড়ীর যোগ নেই, আবার সম্পন্ন মধ্যবিত্তদের ভেতরও এরা স্থান পেলো না। এই অবস্থা-সঙ্কটেই বাংলার সমাজ-জীবন আজ হয়ে পড়েছে বিশৃঙ্খল—কিন্তু আমাদের ভাব-জীবনে আজও অব্যাহত বেগে চলেছে পুরাতন সংস্কৃতির প্রভাব। তাই সাহিত্যের আসরে নিম্নবর্ত্তী স্তরগুলির ভাষা আজো শোনা যায় নি।

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ সম্পন্ন পরিবারে জন্মেছিলেন, স্বভাবধর্ম্মেই তিনি পেয়েছিলেন বুর্জ্জোয়া সংস্কৃতির অন্তঃপ্রেরণা, কাজেই সহানুভূতি ও কবিজনোচিত দরদের দৃষ্টিতে নিরন্ন পল্লী-বাংলার দিকে মাঝে মাঝে তাকালেও, আসলে সে জীবন-ধারার সঙ্গে নিজেকে তিনি মিলিয়ে দিতে পারেন নি, যা কতকটা পেরেছিলেন শরৎচন্দ্র। কতকটা বলছি এই জন্যে যে বর্ণাশ্রমিক প্রভুত্ব ও শ্রেণী-চেতনা থেকে তিনিও ষোল-আনা মুক্ত হতে পারেন নি এবং সম্ভবত রবীন্দ্র-সাহিত্যের অনতিক্রমনীয় প্রভাবই সেজন্যে দায়ী।

অবশ্য শিল্পের বিচারে এটাই এক মাত্র কথা কিনা সন্দেহ। নিছক রস-পরিবেষনের কাজে রঙের জৌলুষটা বাহুল্য নয়, হয়ত অপরিহার্য্যই, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাণ-ধর্ম্মী লেখকের ক্ষেত্রে। ভাষা-শিল্পের ও যুক্তিসিদ্ধ বিচার-বিতর্কের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন রূপে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্য স্মরণীয় হয়েছে, এখানেই তার সত্যকার শ্রেষ্ঠতা।



গল্প

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প নিয়ে আলোচনা করবো। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম সমসাময়িক লেখকেরা বাংলা উপন্যাসকে অনেকটা পূর্ণতা দিয়েছিলেন, কিন্তু ছোট গল্প রচনার দিকে রবীন্দ্রনাথের আগে কারুরই দৃষ্টি পড়ে নি। কালী সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'য়, বঙ্কিম-চন্দ্রের 'লোকরহস্যে'র কতকগুলি রচনায় এবং 'কমলা কান্তের জবান-বন্দী'তে গল্পের ধাঁচা পাওয়া যায়, কিন্তু গল্পের সম্পূর্ণতা নেই। বঙ্কিমের 'যুগলাঙ্গুরীয়', দীনবন্ধু মিত্রের 'পোড়ামহেশ্বর', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ছোট আখ্যায়িকা—গল্প বলতে আজ আমরা যে শ্রেণীর রচনাকে বুঝি, এরা তা থেকে স্বতন্ত্র জাতের। বঙ্কিম-যুগে এই সমস্ত নক্সা, রঙ্গচিত্র ও ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাই সাদরে গৃহীত হয়েছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তন করলেন ছোট গল্পের এবং করলেন সম্পূর্ণ বৈদেশিক আদর্শে। প্রথমে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'তে, তারপর 'ভারতী'তে' তিনি প্রকাশ করতে লাগলেন একের পর এক করে 'গল্পগুচ্ছে'র গল্পমালা এবং তাঁর সমসাময়িকরাও তাঁরই দৃষ্টান্তে এই নূতন পথে লেখনা চালনার প্রবর্ত্তনা পেলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হচ্ছেন সুরেশ সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার। এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের মেজদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথও মূল ফরাসী

থেকে মোপাসাঁ, ব্যালজাক, জোলা, গতিয়ে, দোদে প্রভৃতির গল্প অনুবাদ করে দেশবাসীর সাম্নে মেলে ধরতে লাগলেন। এক দিকে রবীন্দ্রনাথের গল্প, অন্যদিকে বৈদেশিক কথাশিল্পীদের গল্প একযোগে বাঙালীর রুচি-গঠনে যেমন সহায়তা করলো, তেমনি বাঙালী লেখককেও করলো প্রভূত পরিমাণে উৎসাহিত। আজকের দিনে বাংলা ছোট গল্প এমন একটা বিশিষ্ট জায়গায় এসেছে যে তাকে অনায়াসেই বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে স্থান দেওয়া যায়। কিন্তু তার আদি-ইতিহাস সৃষ্টি করেন একক ভাবে রবীন্দ্রনাথ।

তিরিশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ জমিদারী তদারকের ভার নিয়ে শিলাইদহে আস্তানা স্থাপন করেছিলেন। এই সময় জমিদারীর কাজে তাঁকে যেতে হয়েছে গ্রামে-গ্রামে—কখনো নৌকায়, কখনো গরুর গাড়ীতে। সেই সমস্ত অনাগোনার মুখে তিনি দেখেছেন পল্লীবাংলার ছবি, সুখে-দুঃখে তার নিত্য প্রবহমান জীবন তাঁকে মুগ্ধ করেছে। জমিদার রূপে এবং পর্য্যটক রূপে তিনি বিভিন্ন স্তরের লোকের সংস্রবে এসেছেন, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি পড়েছে তাঁর চোখে। কবিসুলভ সহানুভূতির দৃষ্টি নিয়ে তিনি এই জীবনকে চিত্রিত করেছেন কাব্যে ও গল্পে। তাঁর কাব্যের পটভূমি রূপে পল্লীর আসনই সর্ব্বোচ্চে—তাঁর গল্পেও পল্লীই প্রধান অংশ নিয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, 'এক সময় আমি মাসের পর মাস পল্লী-জীবনের গল্প রচনা করেছি। এর পূর্ব্বে বাংলা সাহিত্যে পল্লী-জীবনের চিত্র এমন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয় নি। তখন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখকের অভাব ছিল না, তাঁরা প্রায় সকলেই প্রতাপসিংহ বা প্রতাপাদিত্যের ধ্যানে নিবিষ্ট ছিলেন'।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পল্লীগ্রামকে দেখেছিলেন রোম্যাণ্টিক দৃষ্টি দিয়ে—তার অপরিমেয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের পটভূমিতে সংবদ্ধ শান্তিপূর্ণ সংগ্রামহীন জীবনই তাঁকে করেছিল আকৃষ্ট। তাই কল্পনার পাখায় তিনি হাল্কা ভাবে উড়ে গেছেন সেই জীবনের ওপর দিয়ে—গভীর ভাবে তার ভেতর প্রবেশ করা তাঁর কবি-মনের স্বধর্ম্মেই সম্ভব হয় নি। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' বা 'বামুনের মেয়ে'তে বা 'মহেশে' যে পল্লীর চিত্র আমরা পাই, তাতে রোমান্সের অবকাশ নেই। সে পল্লী নিরন্নতা, নৈতিক ও সামাজিক দৈন্য, দলাদলি, ঈর্ষা, অসূয়া ও নীচতার লীলাভূমি। বলা বাহুল্য তাই হল বাংলা পল্লীর আসল চেহারা—ফলভারানত বৃক্ষ, শস্যসমৃদ্ধ সবুজ মাঠ, স্বচ্ছতোয়া নদী, শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন-যাত্রা, শঙ্খ-ঘণ্টা মুখরিত সন্ধ্যা, বেণুরব বিমোহিত গোষ্ঠ-গৃহ, আর যা-কিছু চলন্ত নৌকা বা ধাবমান রেল-গাড়ী থেকে দেখা ও শোনা যায়, তাতে মাদকতা যাই থাকুক, বাস্তব অবস্থা কিন্তু বড়ই শোচনীয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে বাস্তবকে কল্পনার অনুরঞ্জনে মধুর করে মনোজ্ঞ করেই এঁকেছেন, তাই তাতে পল্লীগ্রামের প্রত্যক্ষ রূপ পরিস্ফুট হয়নি।

রবীন্দ্রনাথের গল্প-সাহিত্যের প্রাণবস্তু বুঝতে হলে, এই জিনিষ-টিকেই মূল-সূত্র রূপে নিতে হবে। শুধু পল্লী-জীবনের গল্পে কেন, সহুরে স্বল্পবিত্ত গৃহস্থদের জীবন নিয়ে তিনি যে সমস্ত গল্প লিখেছেন, তাতেও তাঁর পদ্ধতি একই। তিনি ওপর থেকে আলো ফেলে দেখেছেন, তাতে সব কিছুই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর নিজের আলোতে—আসলে সে ঔজ্জ্বল্য নেই বাস্তবে। অর্থাৎ তাঁর সমগ্র গল্প-সাহিত্যই হল প্রধানত কাব্যধর্ম্মী।

'ক্ষুধিত পাষাণ', 'দুরাশা', 'মণিহারা' প্রভৃতি দূর-সংস্থিত রোমান্সের পটভূমিতে নিবদ্ধ গল্পে এই টেকনিক খুব চমৎকার ভাবেই খাপ খেয়েছে। তাতে কল্পনার যে বিস্তার, রসের যে ব্যাপকতা দেখা যায়, তা কবির প্রসিদ্ধ কবিতাগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্ণনার চাতুর্য্যে, ভাষার কারুকার্য্যে, ভাবের ঐশ্বর্য্যে এই সমস্ত গল্প পরম উপভোগ্য। কিন্তু এই পদ্ধতিই যখন কবি প্রয়োগ করেছেন প্রাত্যহিক জীবনের গল্পে, যেমন 'মধ্যবর্ত্তিনী', 'নিশীথে', 'আপদ' প্রভৃতিতে, তখন বহিরঙ্গিক শিল্প-নৈপুণ্যের অসামান্যতা সত্ত্বেও গল্পগুলি ষোল আনা সার্থক সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারে নি। বাস্তবের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ কবি-কল্পনার মিশেল দিয়েই তৈরী করা হয়েছে এই সমস্ত গল্পকে। সুখে-দুঃখে আঘাতে-সঙ্ঘাতে বয়ে চলেছে মানুষের যে দৈনন্দিন জীবন, তার সঙ্গে এদের বন্ধনের গোড়াটা খুবই আল্গা। এরা ভেসে যায় মনের ওপর পর্দ্দা দিয়ে—খুব নীচু পর্য্যন্ত এদের শেকড় নেমে যায় না। এরা এক-একটা ভাবের গল্প—সত্য সংসার এদের উৎস, কিন্তু পরিণতির পথে এরা বস্তু-সংসারকে বহু পিছনে রেখেই চলে গেছে।

অবশ্য সমস্ত গল্প সম্বন্ধেই একথা নিখুঁত ভাবে প্রযোজ্য নয়। 'মেঘ ও রৌদ্র', 'কাবুলিওয়ালা', 'দিদি', 'হালদার গোষ্ঠী', 'একরাত্রি', 'পোষ্ট-মাষ্টার', 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন' প্রভৃতি গল্প অনেকটাই দাঁড়িয়ে আছে বাস্তবের কাঠামোর ওপর। জীবন-দ্বন্দ্বের রসায়িত ব্যাখ্যান এই গল্প গুলিরও অবলম্বন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সব গল্পে তাঁর পাত্র-পাত্রীরা আমাদের আশেপাশের পরিচিত মানুষদের চেহারাতেই দেখা দিয়েছে। তাদের যে সমস্ত আঘাত-সঙ্ঘাত, তা নিরুপাধিক ভাব-

সঙ্ঘর্ষের লৌকিক রূপায়ন মাত্র নয়। এ গুলি অনেকটাই মধ্যবিত্ত জীবনের গল্প এবং এদিক থেকে এরা বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথেরই নিজস্ব সৃষ্টি। বলা অনাবশ্যক যে তিনি এই ঐতিহ্য স্থাপন করে না গেলে, আজকের গল্প-সাহিত্য এত দ্রুত প্রসার লাভ করতো না। আর আমাদের মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত গল্প তিনি লিখেছেন এখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে—বাংলা সাহিত্যে তখনো চলছে বঙ্কিম-যুগ।

'হিতবাদী', 'বালক', 'ভারতী', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতির আমলেই রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ ভালো গল্প বেরিয়েছে এবং মোটের ওপর তাঁর ছোট-গল্প রচনার যুগ এইখানেই শেষ হয়ে যায়। প্রথমে অনেক খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বের হয় তাঁর 'গল্পগুচ্ছ' বই—পরে দু'খণ্ডে তাদের সময়ানুক্রমে সাজিয়ে গ্রথিত করা হয়েছে। এর পর 'সবুজপত্রে'র আমলে তিনি আবার গল্পের রাজ্যে এসেছিলেন—'চতুরঙ্গে'র প্রত্যেকটি পর্ব্বই প্রথমে আত্মস্বতন্ত্র গল্পের আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, যদিও অবশ্য ভেতরে-ভেতরে তাদের একের সঙ্গে অন্যের আত্মিক যোগ এমন ভাবে বজায় রাখা হয়েছিল, যাতে পরে তাদের পরস্পর সংযুক্ত করে একটি উপন্যাস গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। উপন্যাস-প্রসঙ্গে আমরা এই বইটির উল্লেখ করেছি—সুতরাং পুনরুক্তি করবো না। শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে এই সময় যদি তিনি আর একবার অভিনিবেশ সহকারে গল্প লেখায় নামতেন, তাহলে বাংলা ভাষা আবার এক গুচ্ছ সত্যিকার ভালো গল্প পেতো।

এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের লেখায় তত্ত্বের প্রাদুর্ভাব হয়েছে। তাঁর গোড়ার দিককার গল্পে যে কাব্যিক মধুরতা সকলের চিত্তহরণ

করেছিল, তার সঙ্গে খানিকটা তত্ত্বের খাদ মিশলে গল্প কি রকম হতে পারতো, তার নিদর্শন হল 'জ্যাঠামশায়', 'শ্রীবিলাস', 'দামিনী'। দুর্ভাগ্যবশত কবি এদিকে আর বেশী মন দেননি, দেশও তাঁর কাছ থেকে দাবী করে নূতন গল্প আদায় করে নিতে পারেনি। তার কারণ বোধ হয়, বাংলাভাষায় তখন গল্পের রাজ্যে দেখা দিয়েছেন শরৎচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট লেখকরা।

বার্দ্ধক্যে কবি আর একবার হাত দিয়েছিলেন গল্প রচনায়। 'চার অধ্যায়', 'মালঞ্চ' ও 'দুই বোনে'র উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। কিন্তু এ গুলিকে কবি উপন্যাস সংজ্ঞা দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন— এরা চলছেও উপন্যাস রূপেই। সুতরাং এদের নিয়ে আর পৃথক ভাবে আলোচনা করবো না। এ গুলির পর এই ধারার অনুসরণ করেই তিনি আরো তিনটি রচনা প্রকাশ করেছিলেন—'ল্যাবরেটরী', 'রবিবার', 'ছোটগল্প', একত্রে গ্রথিত হয়ে যা 'তিন সঙ্গী' নামক বই হয়েছে। মৃত্যুর ক'মাস আগেও তিনি 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেন একটি গল্প 'বদনাম' বলে। এই তাঁর সর্ব্বশেষ গল্প। এই গল্পগুলিতে কবির ভাষার ধার যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় এদের প্রতিপাদ্য বিষয় গুলিকে শাণিত যুক্তি-তর্কের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষিপ্রতা। কিন্তু এই ঔজ্জ্বল্য আর গতির বাইরে গল্পগুলিতে আর বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না—মনোধর্ম্মের সুগভীর আবেদন বা আখ্যান-বস্তুর সুনিপুণ বিন্যাস ত নয়ই, এমন কি বক্তব্যের সম্যক পূর্ণতাও এ গুলিতে দেখা যায় না। এগুলি জোরালো লেখনীর লেখা, কিন্তু ক্লান্ত মনের ফসল, তাই সংহত হয়ে রস জমে ওঠবার অবসর পায়নি কোথাও। বলার স্রোতেই কথা বয়ে গেছে, সেই গতির তলায়

তলায় অলক্ষ্যে গল্পের একটা পলিমৃত্তিকার স্তর গড়ে ওঠে নি। এগুলি তাঁর শেষ গল্প রচনা হিসেবেই উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া এদের মধ্যে যে বৈচিত্র্য, নূতনত্ব ও ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়, সে টুকুই বা কম কি? 'সে' নামে তাঁর যে গল্প-সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়েছিল ছোটদের জন্যে, তাতেও কতকগুলি ভালো লেখার সাক্ষাৎ পাই। কিন্তু খাঁটি জাতের গল্প অপেক্ষা খোসগল্প রূপেই সেগুলোর বৈশিষ্ট্য। এরি উন্নত রূপ হল তাঁর সর্ব্বশেষ দান 'গল্প সল্প', শেষ রোগ শয্যা থেকে মুখে-মুখে বলে তিনি লিখিয়েছিলেন এই বই—সেদিক থেকে এ একটি বিস্ময়কর সৃষ্টি। কিন্তু এ-ও খোসগল্পের এলাকাতেই পড়ে, নিছক ছোট গল্পের আসরে এনে এর বিচার হতে পারে না।

মোটের ওপর বাংলা ছোট-গল্প রবীন্দ্রনাথই সুরু করেন এবং নিজেই তার বারো-আনা পূর্ণতা সাধন করে সে রাজ্য থেকে সরে যান, অন্যদের দ্বারা তা অধিকৃত হবার জন্যে। কিন্তু এই স্বল্প কালের ভেতরই তিনি গল্প যা লিখেছেন, সংখ্যায় তা অনেক আজীবন গল্প-লিখিয়ের পুঁজিপাটার সমান—আর নূতনত্বে, বৈচিত্র্যে, শিল্পীক কৃতিত্বে তার বিস্ময়করতাও অসামান্য। যদি আগাগোড়া তিনি গল্প লেখায় নিরত থাকতেন, তাহলে কত বেশী গল্পই তিনি রেখে যেতে পারতেন! মোপাসাঁ, চেকভ, জুদারম্যান প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত গল্প-লেখকের সঙ্গে এদিকেও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে পারতো।

সবশেষে আর একটা কথা বলা দরকার। বাংলা সাহিত্যে আজ যে স্তরের ছোট-গল্প লেখা হয়েছে, তা থেকে উজান হেঁটে রবীন্দ্রনাথের গল্পে গেলে, আমাদের চোখে স্বভাবতই একটা জিনিষ ধরা পড়ে—তা হচ্ছে এই যে আমাদের গল্পের ধারা ও ধরণ আমূল বদলে গেছে।

আজ আমরা লিরিক-প্রধান গল্পের রস গ্রহণ করতে পারি না, একক মনোধর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করেই আজ আমরা গল্পকে দেখি ও বুঝি। বস্তু-বিন্যাসে কোথাও ফাঁক থাকলে, পারস্পরিক মনের খেলা যত নিখুঁত করেই দেখানো হক, আমাদের বিচারে সে-গল্প আজ সার্থক সৃষ্টি হয়ে ওঠে না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই সম্ভাবনীয়তার পথে আমাদের গল্প-সাহিত্যকে এগিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথই এবং আজ পর্য্যন্ত গল্পের ভাষায় আমরা অনুসরণ করেছি শুধু তাঁকেই। সে হিসাবে অন্যান্য সমস্ত ব্যাপারের মতো গল্পের ব্যাপারেও তিনি আধুনিক লেখকের গুরুস্থানীয়।

গদ্য সাহিত্য

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের গদ্যসাহিত্য আশানুরূপ সমাদর লাভ করে নি। এমন কি শিক্ষিত-সমাজেও অনেকে জানেন না যে তিনি গদ্য-রচনাতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এর একটা কারণ হয়ত এই যে বাংলাদেশের মন ভারী জিনিষ নিতে অনিচ্ছুক—এ ছাড়া তাঁর কাব্য-গ্রন্থাবলীর অত্যধিক প্রসার তাঁর বহু-বিচিত্র গদ্য-গ্রন্থাবলীকে কিছু পরিমাণে আড়াল করেও ফেলেছে। তাঁকে আমাদের দেশে জানে প্রধানত কবি বলে, কিন্তু গ্যেটে বা ভিক্টর হুগোর মতো রবীন্দ্রনাথ গদ্যে বড়, না পদ্যে বড়, তার সমাধান আজও হয় নি। তাঁর গদ্য-গ্রন্থাবলীর কিয়দংশ তাঁর কাব্য-গ্রন্থাবলীর পরিপূরক সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী চিন্তা, বিচার-বুদ্ধি ও মনীষার পরিচায়ক গদ্য-সাহিত্যেরও যে একটা অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক স্বাতন্ত্র্য আছে, একথা আজ প্রাণিধান করার সময় এসেছে। কৈশোরে লেখা 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' থেকে সুরু করে, 'রাজাপ্রজা', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'চারিত্র পূজা', 'জীবনস্মৃতি', 'শান্তিনিকেতন', 'লিপিকা', ছিন্নপত্র', 'রাশিয়ার চিঠি', 'বাংলাভাষা পরিচয়', 'বিশ্ব পরিচয়'—কত অসংখ্য গদ্যগ্রন্থই না লিখেছেন তিনি এবং বিষয়ের দিক থেকে, দৃষ্টি ভঙ্গীর দিক থেকে, প্রকাশ-রীতির দিক থেকে তাদের নূতনত্ব, বৈচিত্র্য ও চমৎকারিতাই বা কত!

গল্প, উপন্যাস, কাব্য, নাটক ও গান যদি তিনি আদৌ না লিখতেন, একমাত্র গদ্য-গ্রন্থাবলীই তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের আসন

দিত। তিনি যে রাস্কিন, এমার্সন, ম্যাথু আর্নল্ড প্রভৃতির চেয়ে বড় গদ্য লেখক, সে কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনা সুরু হয় 'ভারতীর' আমলে। প্রথম তিনি সাহিত্য-ক্ষেত্রে দেখা দেন সমালোচক রূপে। তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা হল 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের বিরুদ্ধে— তারই পরবর্ত্তী পরিণতি হল মেঘদূত, শকুন্তলা, রামায়ণ, কাব্যের উপেক্ষিতা, কাদম্বরী, রাজ-সিংহ। 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শন' থেকে তাঁর গদ্য-রচনার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হয়—তখন তিনি দেখা দেন সংস্কারক রূপে। শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, লৌকিক জীবনের সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানকে যুগের আদর্শে ঢেলে সাজার কাজে তিনি এই সময় নিয়োজিত করেন লেখনীকে। 'শিক্ষার বাহন', 'স্বদেশী সমাজ' 'বিলাসের ফাঁস' প্রভৃতি প্রসঙ্গাত্মক রচনার জন্ম এই সময়ে।

এর অল্প পরেই আসে স্বদেশী আন্দোলন, তারই আবহাওয়ায় দেশকে নূতন পথে আপনার মুক্তির সন্ধান করার নির্দ্দেশও তিনি দেন গদ্য-রচনার সাহায্যেই। 'কণ্ঠরোধ', 'রাজকুটুম্ব', 'ব্যাধি ও তাহার প্রতি-কার' প্রভৃতি বিখ্যাত রচনার জন্ম এই সময়ে। এই সমস্ত লেখার বক্তব্য বা প্রতিপাদ্য বিষয় উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ওদের আসল বৈশিষ্ট্য বিষয়ে নয়, ভঙ্গীতে—সাদৃশ্য আরোপ ও উপমা-প্রয়োগের কৌশল, সরস ইঙ্গিত ও বক্রোক্তির কায়দাই এগুলিকে প্রচলিত সম্পা-দকীয় রচনার মতো সাময়িক হতে দেয় নি। যুক্তির ফাঁক হয়ত অনেক জায়গায় পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু উক্তির বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা সর্ব্বত্রই লক্ষণীয়। অর্থাৎ এরা সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ আশ্রয় করে লিখিত হলেও স্থায়ী সাহিত্যের কোঠায় উন্নীত হয়েছে শুধু লেখার গুণে।

অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-সাহিত্য সম্বন্ধে একটু কথা এইখানে বলে রাখা দরকার। তিনি আলোচ্য বিষয়কে আশ্রয় করে দাঁড়ি ধরে হিসাবী লোকের মতো চুলচেরা বিচার করেন না, ধারাবাহিক ভাবে একের পর এক প্রসঙ্গ সমাবেশ করে, শেষ কালে সিদ্ধান্তেও উপনীত হন না। তাঁর সমালোচনা সম্যক আলোচনা নয়—তা অবলম্বিত বিষয়ের উপর নূতন সৌন্দর্য্য আরোপ, বলা যেতে পারে তা নূতন সৃষ্টি। মূলে কি ছিল, আর কি ছিল না, তাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে সে-কথা অপ্রাসঙ্গিক। তিনি যে-দিক থেকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন সেই খানেই তাদের সার্থকতা। শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব বা ছেলে-ভুলানো ছড়ার আলোচনায় তিনি ভালো করেই দেখিয়েছেন যে বিষয়-বস্তু তাঁর সমালোচনায় উপলক্ষ্য মাত্র, তাকে কেন্দ্র করে তাঁর সৃজনী মনই নানা সুরে কথা কয়। বলা যেতে পারে, এর নাম রসাত্মক সমালোচনা।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য-রচনায় তৃতীয় পর্য্যায় সুরু হয় 'সবুজ পত্রে'। তখন থেকে তাঁর রচনা তত্ত্বপ্রধান হয়ে চলেছে। এর আগে তাঁর রচনা ভঙ্গী ছিল প্রধানত ক্ল্যাসিক্যাল—অলঙ্করণে ও বিন্যাস-চাতুর্য্যে তা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক হলেও, তাতে গতির মন্থরতা ছিল। তা আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, যুক্তিকে অতিক্রম করে তা চলে যায় শব্দ-শিল্পের এলাকায়। তৃতীয় পর্য্যায়ে এসে তিনি এই রচনা রীতি পরিহার করলেন। পূর্ব্বের সেই কাব্যধর্ম্মী অলঙ্কারাঢ্য সাধু ভাষার স্থানে এখন তিনি অবলম্বন করলেন সতেজ ও সুস্পষ্ট কথ্য ভাষা—বাংলা গদ্যের ঐশ্বর্য্যবহুল নবযৌবন রূপান্তরিত হল পৌরুষপুষ্ট মধ্য বয়সে। তাঁর এই আমলের গদ্য-রচনায় তীব্রতা আছে, তীক্ষ্ণতা আছে— শাণিত তরবারির মতো সতেজ দীপ্তিতে তা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

বাংলা চলতি ক্রিয়াপদ, সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া-বিশেষণে রচনার প্রাণ-শক্তি যে কতখানি সমৃদ্ধ হতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া গেল এই সময়ের রচনায়। কথ্যভাষায় সাহিত্য রচনা বাংলা দেশে সুরু হয়েছিল অনেক আগেই, একেবারে বিদ্যাসাগরের সময়েই। কিন্তু 'সবুজ পত্রে'র আগে তাকে শিষ্ট সাহিত্যের বাহন বলে কোনদিন মনে করা হয়নি। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', বা 'কলিকাতা কমলালয়' বা এই শ্রেণীর স্যাটায়ার রচনাতেই তার প্রয়োগ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম দেখালেন যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-আলোচনাতেও এই বাহন সুষ্ঠুরূপে প্রয়োগ করা যেতে পারে, আর এ বিষয়ে তিনি পেলেন যোগ্য সহকারী রূপে প্রমথ চৌধুরীকে। এঁরা দু'জনে বাংলা গদ্যের যে নূতন বিন্যাস-পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করলেন, তাই ইদানীন্তন কালে সমস্ত লেখকের অবলম্বন স্বরূপ হয়েছে। সে হিসাবে এঁরা দু'জন, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তিদাতা।

রবীন্দ্র-সমসাময়িক কালে বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যাঁরা গদ্য লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, তাঁদের সকলের ওপরই অল্পাধিক রবীন্দ্র-প্রভাব দেখা গিয়ে থাকে। বিপিন পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পাঁচ-কড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রমুখ রবীন্দ্র-সমসাময়িক বিশিষ্ট গদ্য লেখক সকলেই অল্পবিস্তর রবি-প্রভাবান্বিত। কার্য্যত এঁদের কেউ কেউ দলীয় আবর্ত্তে পড়ে রবীন্দ্র-নাথের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করলেও, এঁদের রচনা-রীতিই এটা ধরিয়ে দেয়। আর ইদানীন্তন কালের, যে-কালের সূচনা প্রমথ চৌধুরী

দিয়ে, সমস্ত লেখকই ষোল আনা রাবীন্দ্রিক। 'কল্লোল', 'কলিকলম' থেকে আজ পর্য্যন্ত যে-নূতন লেখক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে, তাঁরা জীবন-নীতি ও মতবাদে রাবীন্দ্রিক আদর্শকে কেউ কেউ এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করলেও, শব্দচয়নে বা বস্তু-বিন্যাসে তাঁর প্রভাব আদৌ এড়াতে পারেন নি। আমরা আগেই বলেছি যে কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ এদেশে সমধিক প্রসিদ্ধ, তাই সজাগভাবে আমরা করেছি তাঁর কাব্য সাহিত্যের অনুশীলন। কিন্তু তাঁর গদ্য-সাহিত্য অলক্ষ্যেই আমাদের ভাব-প্রকাশের ও ভাষা-বিন্যাসের ওপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে, তা আমরা ভালো করে টেরও পাই নি। সাম্প্রতিক সাহিত্যের পুঁজি-পাটা যাচাই করতে বসলেই বোঝা যায়, কবির গদ্য-রচনা আমাদের মনে কি গভীর প্রভুত্বের আসন বিস্তার করেছে।

কবির গদ্য-রচনার সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো দু-একটি কথা এখানে বলে রাখা দরকার। গদ্য বলতেই যে কাটা-ছাঁটা কাজের কথা বোঝায়, যা ব্যবহৃত হয় আমাদের পাঠ্য পুস্তকে, নয়ত খবরের কাগজে, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেই শ্রেণীর গদ্য কখনই লেখেন নি। পাঠকের গোচরে বক্তব্য পেশ করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাঁর সাহিত্যে ভঙ্গীটাই প্রধান—তারই গুণে তাঁর হাতে সাময়িক প্রসঙ্গও যেমন স্থায়ী সাহিত্যের পর্য্যায়ে উন্নীত হয়, তেমনি গদ্যের বাঁধনে খাঁটি জাতের কাব্যও বাঁধা পড়ে। নিছক কাজের কথায় পূর্ণ বস্তুগত লেখার প্রাত্যহিক মূল্য যাই হক, সাহিত্যিক মূল্য বেশী নয়। পক্ষান্তরে অতি তুচ্ছ বা উপেক্ষণীয় জিনিষকে আশ্রয় করেও সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে। ইংরাজীতে ল্যাম্ব দেখিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশে ঠিক এই শ্রেণীর গদ্য-রচনার পরিমাণ খুব বেশী নয়। আমাদের গদ্য-সাহিত্য

সূচনা থেকেই সিরীয়াস। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজেনারায়ণ বসু প্রমুখ লেখকরা ধর্ম্ম, সমাজ ও নীতির আলোচনাতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ রেখেছেন তাঁদের রচনাবলী। বলাই বাহুল্য এই সমস্ত রচনা সমাজহিতে যা করেছে, তার মূল্য সমধিক। কিন্তু মনের রাশ আল্গা করে সহজ আনন্দে সাহিত্য পাঠ করার পুঁজি এঁদের রচনায় দুর্লভ। এমন কি বঙ্কিম-সাহিত্যেও নিছক সাহিত্যিক প্রবন্ধ নেই বললেই চলে। রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একালে', সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'-এ, চন্দ্রনাথ বসুর 'একটি পাখী', 'পল্লীবাসের সুখ-দুঃখ' প্রভৃতি প্রবন্ধে ছিটেফোঁটা সাহিত্য-রসের আভাষ পাওয়া যায়, যাতে বিষয়ের চেয়ে ভঙ্গী বড়, বক্তব্যের চেয়ে বাচন বড়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের আগে এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কেউ শ্রদ্ধার সঙ্গে লেখেন নি। তার কারণ প্রবন্ধকার আমাদের দেশে থেকেছেন প্রধানত শিক্ষকের আসন অধিকার করে, সহৃদয় বন্ধুর মতো পাঠকের কাছে নেমে আসার সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। 'পায়ে চলার পথ', 'শ্রাবণ সন্ধ্যা', 'কেকাধ্বনি' প্রভৃতিতে কবি এই যে একটি বিশেষ শ্রেণীর প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত করেন, পরবর্ত্তী কালের লেখকরা তা থেকে প্রভূত প্রেরণা লাভ করেছেন।

এই শাখার অনুপূরক রূপেই উল্লেখযোগ্য কবির পত্রসাহিত্য, ভ্রমণ কাহিনী এবং আত্মজীবনীমূলক রচনাগুলিও। 'ছিন্নপত্র', 'ভানু-সিংহের পত্র', 'পথে ও পথের প্রান্তে' প্রভৃতি পত্র-প্রবন্ধ, 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র', 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী', 'জাপান যাত্রী', 'রাশিয়ার চিঠি' প্রভৃতি ভ্রমণ-চিত্র এবং 'জীবন-স্মৃতি', 'ছেলেবেলা' প্রভৃতি আত্মকাহিনী আদর্শ ব্যক্তিক রচনা হিসেবেই চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য।

এই সমস্ত রচনায় আমরা পাই কবির নিজের মনের রং—দর্শনীয় ও চিন্তনীয় বিষয়গুলিকে তিনি এঁকেছেন ততটা বাস্তবের ওপর নজর না রেখে, যতটা নিজের মনের স্বপ্ন আরোপ করে, তাই তাঁর ভ্রমণে গন্তব্য স্থানটা বড় নয়, যাত্রা বড়, জীবন স্মৃতিতে স্মৃতি বড় নয়, জীবন বড়। তাঁর ধর্ম্মমূলক নিবন্ধ-সংগ্রহ 'শান্তিনিকেতন'ও এই জাতের লেখা—তাতে ধর্ম্মের তত্ত্ব আছে এবং তার বিশ্লেষণও আছে, কিন্তু সে হল তাঁর নিজের সংজ্ঞা দিয়ে নিজের অনুভূতির ব্যাখ্যান। তাতে বিধি-বরাদ্দ ধর্ম্ম এবং তার বিচার-বিশ্লেষণ নেই—তাঁর স্বকীয় জীবন ও মননের মধ্যে দিয়ে যে সমস্ত অনুভূতি সত্য হয়ে উঠেছে, বাস্তবের সঙ্গে চিত্তবৃত্তির সঙ্ঘাত থেকে যে বোধগুলি দুর্নিরীক্ষ্য ঐশী শক্তির অভিমুখে ধাবিত হয়েছে, তারই বিভিন্ন পর্য্যায় বিচিত্র সাহিত্য-রূপ লাভ করেছে। সেই জন্যে এগুলিকেও মোটের ওপর ব্যাক্তিক রচনার শ্রেণীতেই ফেলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাহিত্যে তাঁর ব্যক্তি-রূপ অনেকটা প্রচ্ছন্ন। তিনি একক অনুভূতিকে সার্ব্বভৌম অনুভূতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দিতেই অভ্যস্ত, একের সমস্যাকে সমস্ত জগতের সমস্যা রূপে দাঁড় করানোই তাঁর পদ্ধতি। সেই জন্যে তাঁর কাব্যের আবেদন সাধারণত অপৌরুষেয়—তাতে ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার প্রত্যক্ষ ছাপ ততটা পাওয়া যায় না, যতটা যায় তাঁর গদ্যসাহিত্যে। আগেই বলেছি যে তাঁর গদ্য-সাহিত্য কতকাংশে তাঁর কাব্য-সাহিত্যের অনুপূরক। এর মানে এই যে তাঁর কাব্যে যে-দৃষ্টি ও অনুভূতি দুরারোহ রসের স্তরে উন্নীত হয়ে পাঠকের প্রাত্যহিক নাগালের বাইরে গেছে, গদ্য-সাহিত্যে সেই সূক্ষ্ম ও অনেক ক্ষেত্রে নিরুপাধিক

অনুভূতিকে তিনি হাতে-কলমে উপস্থাপিত করেছেন—বিশ্লেষণ ও বিচারের দ্বারা তার মর্ম্ম সম্যক ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন। এ সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে তাঁর কাব্য-সাহিত্যের সমগ্র আবেদন জন-মনে কখনই পৌছুতো কি না, যদি না তার পেছনে তাঁর স্বকীয় গন্থ-সাহিত্য ব্যাখ্যাতা রূপে উপস্থিত থাকতো। তাঁর জীবনদেবতাবাদ, অভিব্যক্তিবাদ, বিশ্বমানবতাবাদ, প্রকৃতি, জীব ও পরমার্থের পরস্পরিক সংস্রবকে আশ্রয় করে প্রবাহিত লীলাবাদ—এক কথায় রবীন্দ্র-কাব্যের অন্তর্নিহিত যা-কিছু তত্ত্ব, সবই ব্যাখ্যাত ও আলোচিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন গন্থগ্রন্থে। জীবন-রহস্যের দিব্যরূপ যা, তারই মতো প্রত্যক্ষ রূপ যা, তারও নানা দিকের ব্যাখ্যা তাঁর গন্থ-সাহিত্যে সুলভ। রাজনীতি, ধর্ম্ম, সমাজ, সংস্কৃতি—এক কথায় মানব-সভ্যতার যা-কিছু মৌলিক উপকরণ, তাকে তাঁর কাব্যে যথা-সম্ভব সঙ্কুচিত করেই স্থান দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্কোচন অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কাব্য-সৃষ্টির মূল-উৎস সন্ধানের পথে বাধা জন্মায়। গন্থ-সাহিত্যে এই দিকগুলির সম্বন্ধে চিন্তা ও মতামতের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় বলেই ঐ ফাঁক সহজে পূরণ করা যায়। অর্থাৎ কবি ও ভাবুক রবীন্দ্রনাথের আড়ালে প্রচ্ছন্ন যে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, তাঁর সমগ্র পরিচয় নিহিত রয়েছে তাঁর গন্থসাহিত্যে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গন্থ যে একান্তভাবে তাঁর কাব্যের মর্ম্মোদ্ঘাটনেই নিঃশেষিত নয়, একথা আশা করি পাঠকেরা বুঝতে পেরেছেন। আত্মস্বতন্ত্র সাহিত্য হিসাবেও তা অপূর্ব্ব। কি রাজনীতিক আন্দোলনে, কি সমাজসংস্কার সম্পর্কীয় সম্প্রতিক আলোচনায়, কি ছন্দ, অলঙ্কার বা বৈয়াকরণিক তত্ত্বের গবেষণায়, কি বিজ্ঞান, ইতিহাস বা দর্শনের প্রসঙ্গ-

বিশ্লেষণে—সর্ব্বত্রই তাঁর লেখনী রূপে-রসে অপূর্ব্বতা লাভ করেছে।

সংক্ষেপে তাঁর গদ্যসাহিত্যকে মোটামুটি দু' ভাগে ভাগ করা যায়—প্রসঙ্গাত্মক গদ্য, আর আত্মবীক্ষা-সূচক গদ্য। পত্র-সাহিত্য, ভ্রমণ, আত্মকাহিনী অথবা ধর্ম্মবাণী সংক্রান্ত বক্তৃতা ইত্যাদি পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে—যাতে পাওয়া যায় কবি ও দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের ভাব-সত্তার পরিচয়। আর প্রথম ভাগে পড়ে বাকী সমস্ত গদ্যগ্রন্থ, যাতে পাওয়া যায় কর্ম্মী, সংস্কারক ও ভাব-নায়ক রবীন্দ্রনাথের মননশীলতার পরিচয়। এক সঙ্গে এই দুই-ই ছিলেন তিনি। তাঁর কাব্য, গান, নাটক, উপন্যাস ও গল্প-সাহিত্য থেকে তাঁর এই সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ-সাহিত্য গদ্যপর্য্যায়ের অপরাপর রচনার চেয়ে অনেক বেশী অনুশীলন ও অনুধাবনের যোগ্য। পৃথিবীতে যাঁরা কেবল মাত্র গদ্য-লিখিয়ে রূপেই প্রসিদ্ধ, তাঁদের কারোর লেখাতেও এত বেশী বৈচিত্র্য, এত বেশী বৈশিষ্ট্য আছে কিনা সন্দেহ।

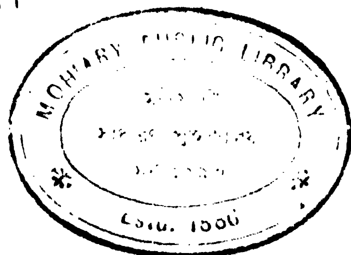
শেষজীবনে রবীন্দ্রনাথের কাব্য তত্ত্ববাহুল্যে একটু নীরস হয়ে পড়ছিল। কিন্তু গদ্য লেখায় তাঁর হাত ছিল অক্ষুণ্ণ। এমন কি এদিক থেকে তাঁর লেখনী অধিকতর তীক্ষ্ণ এবং মর্ম্মাভিমুখী হয়েছিল বলেই মনে হয়। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে লেখা 'ছেলেবেলা' বইয়ে, অথবা শেষ রোগশয্যা থেকে লেখা 'সভ্যতার সঙ্কট' বক্তৃতায়, বা 'গল্পসল্প' নামক খোসগল্পের সংগ্রহে তাঁর লেখনীর যে ধার দেখা যায়, তা সত্যিই বিস্ময়কর। ষোল বছর বয়সে তিনি লিখেছিলেন 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'—তখনকার 'জলধরপটলী' আবহাওয়ায় প্রত্যহের ব্যবহারে প্রযুক্ত

ঘরোয়া কথ্যভাষা ব্যবহারের প্রেরণা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, তা তিনিই জানতেন। কিন্তু এই ভাষায় দীপ্তি, সুষমা ও শক্তি ছিল অসাধারণ। এই বইটি থেকে এখানে একটু উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

'হয়ত বুঝতে পারছ কি কি মসলার সংযোগে বাঙালি বলে একটা পদার্থ ক্রমে ইঙ্গ-বঙ্গ নামে একটা খিচুড়িতে পরিণত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়াটা বিস্তারিত করে লিখতে পারি নি। এত সব ছোটো ছোটো বিষয়ের সমষ্টি মানুষের মনে অলক্ষিত পরিবর্তন উপস্থিত করে যে সকল খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে গেলে পুঁথি বেড়ে যায়।'

এরপর তুলে দিচ্ছি 'সভ্যতার সঙ্কট থেকে', যা এক হিসাবে তাঁর সর্ব্বশেষ উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে পঁয়ষট্টি বছরের—

'আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ। কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত আরম্ভ হবে।'



পত্র সাহিত্য

বাঙালী পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য সুপরিচিত। দীর্ঘকাল হল তাঁর 'ছিন্নপত্র' বের হয়েছে—তারপর 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' এবং 'রাশিয়ার চিঠি'। ছিন্নপত্রে তরুণ রবীন্দ্রনাথ বস্তু-সংসারে নিত্যদিন সুখ-দুঃখ ও আলো-ছায়ার যে সহজলীলা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই অনাড়ম্বর সহজ ভাষায় রূপ দিয়েছেন। অনায়াসে লেখা বলেই সে-গুলোর ওপর কোথাও কৃত্রিমতার ছাপ নেই। এক-একটি চিঠি এক-একটি ছবির মতো, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ—তার আড়াল থেকে রচয়িতার যে রূপটি পাওয়া যায়, তা একটি ভাবমুগ্ধ কবির রূপ। ভানু-সিংহে কিন্তু এ রূপের পরিবর্ত্তন ঘটেছে—যদিও ভানুসিংহ চিঠিগুলো লিখেছিলেন একটি ন'বছরের বালিকাকে এবং এর অন্তর্গত ছোটখাটো নানা হাসিঠাট্টার ইঙ্গিত সেই উদ্দেশ্যেরই সমর্থন করে, তবু মনে হয় ভানুসিংহের অবলম্বন বস্তু-সংসার ও তার বিচিত্র প্রাণ-লীলা নয়—এর বিষয় কবি রবীন্দ্রনাথের মনোভূমির ভাবলীলা। বস্তু-জগৎ অনেকটাই আমাদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে—কাজেই তাকে যখন বর্ণনার বিষয়ীভূত করা হয়, তখন আমরা অভ্যস্ত পথে হাঁটতে হাঁটতেই অনভ্যস্ততার চমকে আত্মহারা হই—সেইটুকুই তার দান। কিন্তু হৃদয়-রহস্যের অপ্রবুদ্ধ অনুভূতি ছাড়া প্রাকৃত জনের পুঁজি বড় বেশী নয়—তাই মনের গহনে অহরহ নানা বহির্সংঘাতকে উপলক্ষ্য করে যে সব ছোটবড় আবর্ত্ত সঞ্চারিত হয়, সেখানে কল্পনা ও স্বপ্নের ওপর বরাত না দিয়ে উপায় নেই।

তাই মনে হয়, ছিন্নপত্র অতি সহজ স্বভাবোক্তির কবিতা, আর ভানুসিংহ নিগূঢ় ভাব-ব্যঞ্জনাময় লিরিক কবিতা।

রাশিয়ার চিঠি এ দুই থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের জিনিষ। ওতে কোথাও কোন অনুভূতি, কল্পনা বা অলঙ্করণের বাষ্পও নেই, সহজ দৃষ্টিতে রাশিয়ার সমাজ, রাষ্ট্র এবং শিক্ষায়তনের যে রূপ কবি দেখেছেন, তাকেই সর্ব্বজনবোধ্য করে যুক্তি-তর্ক ও বিচার-বিশ্লেষণ সহকারে বুঝিয়েছেন। সেখানে বক্তব্যটাই তাঁর বড় কথা এবং সেটাকে সুন্দর করে, স্পষ্ট করে বলাকেই তিনি লক্ষ্য হিসাবে নিয়েছেন। ছিন্নপত্রে বা ভানুসিংহে আমরা যে ভাবাবেগের সহজ অজস্রতা ও লিপি-চাতুর্য্যের সুসঙ্গত পরিপাটিতা দেখি, রাশিয়ার চিঠিতে তার বদলে দেখি, একটা সুস্পষ্টতা, একটা প্রজ্ঞাশীল বিশ্লেষণমুখিতা। এ ছাড়া আর একটা জিনিষ দেখি, সেটাই এই প্রসঙ্গে সব চেয়ে বড় লক্ষ্য করার বিষয়। ছিন্নপত্র বিশেষভাবে আত্মকেন্দ্রিক—সেখানে দ্রষ্টা বা বোদ্ধা রূপে কবি দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর উপলব্ধিকে রূপ দেননি, তিনি নিজেকে তাঁর প্রতিপাদ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে নিয়েই দেখেছেন। কাজেই বাইরেটার ওপর যেমন এসে পড়েছে তাঁর আলো, তেমনি তাঁর ওপরেও এসে পড়েছে বাইরের আলো—পরস্পরের আলোকে পরস্পরের রূপ অধিকতর সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে ভাষার মায়াজালে। ভানুসিংহ সে হিসাবে অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু তাতেও আমরা কবির ব্যক্তি-সীমাকে একেবারে ছাড়িয়ে যাইনে। তাঁর হৃদয়-রহস্যের আরোহ-অবরোহের মধ্যে দিয়েই তাঁর কল্পসত্তার স্পর্শ পাই, যা তাঁর প্রাত্যহিক জীবনকে উজ্জ্বলতর করে আমাদের চোখে ফুটিয়ে তোলে। রাশিয়ার চিঠি সে হিসাবে প্রবন্ধ এবং সর্ব্বাংশে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। এগুলো কোন কোন

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল সত্যি, কিন্তু আসলে এগুলোতে লক্ষ্য করা হয়েছিল সাময়িক পত্রিকার স্তম্ভকে। তাই ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রচ্ছন্ন পদসঞ্চারে ওরা রসাত্মক সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি, ওরা হয়েছে তত্ত্ব-বিচার। কবি ওগুলি লিখেছেন কর্ত্তব্যবোধে, আনন্দাবেশে নয়।

এতদিন রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য বলতে মোটের ওপর আমাদের এইটুকুই পুঁজি ছিল। এছাড়া সাময়িক পত্রে তাঁর বিভিন্ন সময়ের লেখা কতক কতক চিঠির সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে—তারপর আর কিছু না। কিন্তু যা এ পর্য্যন্ত সাধারণের গোচরে এসেছে, তা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পত্র-সাহিত্যের এক-চতুর্থাংশ মাত্র। অবশিষ্ট অংশ এতদিন তাঁর প্রকাশ-বিভাগের দপ্তরেই আটক ছিল। সম্প্রতি তা থেকে নির্ব্বাচন করে আর এক খণ্ড বই বের করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পত্র-ধারা সম্পাদনে যে পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে, তার একটু আভাষ দেওয়া যেতে পারে।

কবির নিজের অভিপ্রায় এই ছিল যে যে-সমস্ত চিঠি মূলত তত্ত্ব-বিচার, তথ্য প্রচার বা মতবাদ বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ, প্রত্যক্ষত যা সাহিত্য নয়—যা হয় বিতর্ক, নয় ভ্রমণ-বিবরণ, নয় আলাপ-আলোচনা, সেগুলো চিঠির আকারে লেখা হলেও অনেকটা প্রবন্ধ গোত্রীয়, কাজেই সেগুলিকে খাঁটি জাতের পত্র বলে গণ্য করা চলবে না—অর্থাৎ রাশিয়ার চিঠি বা পাশ্চাত্য ভ্রমণ বা এই জাতের রচনাগুলিকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের অন্তর্গত করে দেখতে হবে। আর যে সমস্ত চিঠি লেখকের প্রাত্যহিক ছোট-বড় ব্যক্তিগত অনুভূতির রঙে অনুরঞ্জিত, অর্থাৎ যার গরিমা বিষয়-গৌরবের জন্যে নয়, আন্তরিক অনুভূতি ও মনোজ্ঞ প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে যা অনেকাংশে আত্মজীবনী-মূলক (কারণ সত্যিকার আত্মজীবনী

প্রত্যক্ষ জীবনের বিবরণ মাত্র নয়—তা হচ্ছে অন্তর-সত্তার নিত্য ক্রিয়াশীলতার ইতিহাস), তাই হল সত্যিকারের চিঠি, এবং তাই এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেই অনুসারেই এই পর্য্যায়ের পত্র-সাহিত্যকে 'পত্রধারা' এই সাধারণ নামে অভিহিত করা হয়েছে এবং 'ছিন্নপত্র'কে প্রথম, 'ভানুসিংহ'কে দ্বিতীয় এবং 'পথে ও পথের প্রান্ত'কে তৃতীয় খণ্ডরূপে প্রকাশ করা গেল। পরবর্ত্তী খণ্ডগুলিতেও এই আদর্শই অনুসৃত হবে।

আলোচ্য খণ্ড সম্পর্কে একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। এই পত্রগুলি সমস্তই লেখা হয়েছিল শ্রীমতী রাণী মহলানবীশকে, যেমন ছিন্নপত্র সমস্তই লেখা হয়েছিল শ্রীশ মজুমদারকে ও কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীকে এবং ভানুসিংহের পত্রাবলী লেখা হয়েছিল শ্রীমতী রাণু অধিকারীকে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ যখন তৃতীয় বার ইউরোপ যাত্রা করেন, সে সময় শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ এবং তাঁর পত্নী কবির সঙ্গে ছিলেন—কবি ভ্রমণ শেষ করে দেশে ফিরলেন, কিন্তু মহলানবীশরা ইউরোপেই থেকে গেলেন। ফেরার বেলা কবি পত্রযোগে তাঁদের সঙ্গে যে আদান-প্রদান করেছিলেন, তা প্রধানত পথে বলেই এই পত্রাবলীর নাম 'পথে ও পথের প্রান্তে'। অবশ্য কতকগুলি পত্র দেশে ফিরেও লেখা হয়েছিল।

ছিন্নপত্র বা ভানুসিংহের সঙ্গে এই খণ্ডের একটা প্রধান বিভিন্নতা চোখে পড়বে—তা হচ্ছে এর দৃষ্টির ব্যাপকতা ও প্রকাশের নিরাভরণতা। এটা রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যের ক্রমপরিণতির নির্দ্দেশক। সময়ে-অসময়ে কোন প্রসঙ্গ, কোন ঘটনা, কোন চিন্তা বা ভাবকে আশ্রয় করে কবির চিত্তে যে দোলা লেগেছে, তাকে কবিতায় রূপ দিতে হলে, তাঁকে

ছন্দ, অলঙ্কার ও আনুষঙ্গিক উপকরণের শরণাপন্ন হতে হত, আর যদি তাকে প্রবন্ধে রূপ দিতে হত, তাহলে যুক্তি-পরম্পরার অনুসরণ করতে হত—তাতে দেখাতে হত একটা আরম্ভ, একটা ক্রমিক গতি ও সবশেষে একটা পরিণতি—উভয় ক্ষেত্রেই যে-কথাটা সহজে চিন্তাকে অধিকার করেছিল, তার মুখে লাগাম পরাতে হত—অনেক ডালপালা ছাঁটতে হত, অনেক ঘোরপ্যাঁচ অবলম্বন করতে হত এবং কাব্য বা প্রবন্ধের প্রত্যাশিত ঐতিহ্যের অনুগমন করতে হত। তার চেয়ে চিঠির শরণাপন্ন হওয়ায় একটা সুবিধা হয়েছে এই যে এখানে কবি লেখনীকে অব্যাহত বেগে বহাতে পেরেছেন। এতে যেখানে কাব্য আসার, আপনিই এসেছে, যেখানে প্রবন্ধ হবার, আপনিই হয়েছে—অথচ দুটোকে ছাপিয়েই একটা ব্যক্তিগত ভাবব্যঞ্জনা এদের ভেতরে ভেতরে প্রবাহিত হয়ে এদেরকে সংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট জাতি-বিচারের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে এদের মধ্যে একমাত্র যে ধর্ম্ম প্রকট হয়েছে, তা নির্ভেজাল সাহিত্য-ধর্ম্ম। টুকরো টাকরা সুখ-দুঃখের, বিশেষত হাসি-ঠাট্টার স্পর্শে এরা জীবন্ত ও মুখর। পাঠকের সঙ্গে এদের ভেতর দিয়ে কবির যেন হয়েছে সামনাসামি বাণী বিনিময়। রবীন্দ্রনাথের সুবৃহৎ সাহিত্যে এই দিক থেকে পত্র-পর্য্যায়টি যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, বরং অন্যান্য অনেক পর্য্যায়ের চেয়ে যে এর বিশিষ্টতা ঢের বেশী, সমগ্র পত্রধারা থেকে একথা স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হবে আশা করি।

বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের কারুরই প্রায় পত্র-সাহিত্য নেই। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিতে তাঁদের যে পত্রাবলী আহৃত হয়েছে, তা বড় বেশী বৈষয়িকতাদুষ্ট—সাহিত্য হিসাবে তা

উপভোগ্য নয়, যদিও জীবনেতিহাসের দিক থেকে তা সবিশেষ মূল্যবান। মধুসূদনের পত্রগুলি অবশ্য সুন্দর—তাঁর সমুদয় রচনার মধ্যে এইগুলিই সমধিক প্রাঞ্জল, স্বচ্ছ এবং মর্ম্মানুগামী, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার প্রত্যেকটিই ইংরেজীতে লেখা। নবীনচন্দ্রের 'প্রবাসের পত্র' সুখপাঠ্য এবং উপভোগ্য, কিন্তু বড় বেশী অগভীর। এ ছাড়া দ্বিজেন্দ্রলালের বা স্বামী বিবেকানন্দের বিলাত-ভ্রমণ সম্বন্ধীয় পত্রাবলী আছে, যা সাহিত্যাংশে অনেক স্থানে উপাদেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা যে উক্ত লেখকদ্বয়ের খুব বিশিষ্ট জাতের রচনা নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্যের সাদৃশ্য ইংরাজী সাহিত্যে পাই—কুপার, শেলী, কীটস বা বাইরণের, কিংবা আধুনিক কালের লরেন্স বা ব্রিজেসের পত্রাবলী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা এই শ্রেণীর সাহিত্যের মূল্য ও মর্য্যাদা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করবেন।

বলা বাহুল্য একথা আমরা বলছি না যে রবীন্দ্রনাথের পত্র-সাহিত্য বুঝতে বাঙালী পাঠককে আদাজল খেয়ে ইংরেজী পত্র-সাহিত্যের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমরা যা বলছিলাম, তা হচ্ছে আত্মরূপ্যের কথা। সাহিত্য যখন লিখিত হয়, স্বভাবধর্ম্মেই তা লেখকের ব্যক্তিসীমা থেকে অনেকটা দূরে এসে পড়ে, তাতে লেখকের যে ছোঁয়াটুকু আমরা পাই, তা হচ্ছে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাব-রূপ—সেখানে সমগ্র দেশবাসী বা ভাবী কালকে লক্ষ্য হিসাবে নিতে হয়, কাজেই নিজের প্রত্যক্ষ সত্তা স্বভাবধর্ম্মেই সেখানে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কিন্তু চিঠি যখন লেখা হয়, তখন তার লক্ষ্য থাকে কাছের লোকটি, কাজেই তার এলাকা দূর-নিবদ্ধ না হওয়ায় তা অনায়াসেই অন্তরের রসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। এদিক থেকে পত্র-সাহিত্য সমস্ত বড় লেখকেরই সাহিত্য

ও জীবন বিচারের নিশ্চিততম মানদণ্ড—নিজের সাহিত্য ও নিজের জীবনকে সাম্নে দাঁড় করিয়ে, তাকে বিশ্লেষণ করার স্থযোগ লেখকদের আর কোথাও হয় না চিঠি ছাড়া। স্থতরাং পত্র-সাহিত্য অনেকাংশে মূল সাহিত্যেরই পরিপূরক—বিশেষত রবীন্দ্র-সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বলে রাখা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম গদ্যগ্রন্থ হল 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র'। এই বইয়ের রচনাকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ষোল-সতেরো বৎসর। আশ্চর্য্যের বিষয় এত আগেই চিঠিতে তিনি পূর্ণভাবে কথ্যভাষাকে অবলম্বন করেছিলেন। সে বই এখন 'পাশ্চাত্য ভ্রমণে'র অন্তর্গত।

শিশু সাহিত্য

শিশুসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও, সাহিত্যের এই বিভাগটিতেও তাঁর বৈশিষ্ট্য কম নয়। বিস্ময়ের কথা যে এই রাজ্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখা যা, 'ছড়ার ছবি', 'খাপছাড়া', 'সে', 'গল্পসল্প', 'ছেলেবেলা' সবই তিনি লেখেন পরিণত বার্দ্ধক্যে। অপচিত স্বাস্থ্যে যখন শ্রমসাধ্য কাজের শক্তি তাঁর ক্রমশ কমে আসছে, তখন হাল্কা কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্যেই বোধহয় তিনি বিশেষ করে শিশুসাহিত্য রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তবে শিশুদের সম্পর্কে তাঁর অনুরাগ চিরদিনই ছিল এবং আগেও যখনি সময় পেয়েছেন, তখনি তিনি ছেলে-মেয়েদের উপযোগী ছড়া, কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন।

পত্নী-বিয়োগের পর মাতৃহীন শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যে তিনি লিখেছিলেন 'শিশু'র কবিতা গুলি—'শিশু ভোলানাথে'র কবিতাগুলি তারি বিলম্বিত পরিপূরক। 'শিশু'র ও 'শিশু ভোলানাথে'র কবিতা বাংলা ভাষার ভাণ্ডারে সমাদরে গৃহীত হয়েছে, হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এগুলিকে ঠিক শিশু-কবিতা বলা চলে না—শিশু-মনের অপার রহস্যময়তা, তার রকমারি খেয়ালী কল্পনা, অলীক কামনা ও অবুঝ অনুভূতিকে কবি স্নেহশীল প্রবীণের চোখ দিয়ে দেখেছেন এবং তাকে রূপায়িতও করেছেন প্রবীণেদের উপভোগ্য করেই। তবে প্রকাশভঙ্গীর ক্ষেত্রে তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই তরল শব্দের আশ্রয় নিয়েছেন, তাই শিশুরাও

তা পড়ে অপ্রবুদ্ধ ভাবে কতকটা আনন্দ পায়। কিন্তু তাদের বোধশক্তির স্বল্প পুঁজি এসব কবিতার শব্দার্থ অতিক্রম করে ব্যঞ্জনা পর্য্যন্ত পৌছুতে পারে কি না সন্দেহ। পরিণত মনের চিন্তা ও উপলব্ধির ছাপ তাদের ছত্রে ছত্রে এত স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যাতে বলা যেতে পারে যে শিশু এই সব কবিতার বিষয় হলেও, সব সময় এর পাঠক নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উদ্ধৃত করছি—

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্যকালের তুই পুরাতন,
তুই প্রভাতের আলোর সমবয়সী,
তুই জগতের স্বপ্ন হতে,
এসেছিস আনন্দ-স্রোতে,
নূতন করে আমার বুকে বিলসি।

অবশ্য শিশু ও শিশু ভোলানাথের মধ্যেও এমন কবিতা আছে, যা নিছক ছোটদের কবিতা হিসেবেই গণ্য হবে। 'তালগাছ', 'নদী', 'কাগজের নৌকা', 'বীর পুরুষ', 'খোকার বনবাস' ইত্যাদি কবিতা কে না পড়েছেন? এ রকম শিশু-কবিতা কবি আরো লিখেছেন, তাঁর বিভিন্ন কবিতার বই খুঁজলেই তা পাওয়া যাবে। 'পূরবী'র 'শিলং-এর চিঠি'কেই ধরা যাক তার একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রূপে।

কিন্তু 'ছড়ার ছবি' আগাগোড়াই শিশুদের কবিতা—একটা ছোট ঘটনা, নয়ত একটা কোন লোক বা স্থানকে কেন্দ্র করে একটা গল্প—সে গল্পও গাল-ভরা কিছুর কাহিনী নয়, অতি লঘু এক-একটা সুখ-দুঃখের বিবরণ, যা সহজেই শিশুচিত্তে সাড়া তোলে—তাই নিয়েই এর কবিতা। 'আকাশ প্রদীপ', 'অজয় নদী', 'ছবি আঁকিয়ে', 'বাসাবাড়ী', যে-কোন

কবিতার উল্লেখ করি, তারি সুর যেমন মধুর, তেমনি মোলায়েম, কোথাও কোন খোঁচ নেই, শিশুর রসবোধ যাতে আহত হবে। 'খাপছাড়া' হল টুকরো টুকরো রঙ্গ-কবিতার সংগ্রহ—কোনটা নক্সা, কোনটা ঠাট্টা, কোনটা বা একটু ইঙ্গিত—বেশীর ভাগই নূতন নূতন ছন্দ নিয়ে খেলা, আর সেই খেলার সঙ্গেই আছে খেয়াল মতো আঁকা কবির নিজের ছবি। ছোটরা 'ছড়ার ছবি' পড়ে উপভোগ করবে, আর 'খাপছাড়া' পড়ে 'পাবে আনন্দ। বস্তুত ও দুইই আসলে এক ফলদায়ী হলেও, একের গতি গূঢ়তার দিকে, যে-দিক দিগন্তপ্রসারী কল্পনা-লোকের পথ নির্দ্দেশ করে—অন্যের গতি অবাধ আনন্দের জনতার দিকে, যা থেকে বাস্তবের রকমারি ভালো-মন্দ ফসল কুড়িয়ে তারা ভাবের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে পারবে। বাংলা সাহিত্যে এই ধরণের কবিতার ভিত পত্তন করেন সুকুমার রায়—গুরু এসেছেন এ পথে শিষ্যের পরে এবং এসেছেন পূর্ণতর শক্তি নিয়েই।

'সে' বইখানির বিশেষত্বও উপেক্ষণীয় নয়। তা রূপকথা নয়, এডভেঞ্চার নয়, বর্ণহীন নীরস প্রত্যক্ষতার কাহিনীও নয়—তা রস-সাহিত্য, হাল্কা হাতে তৈরী—যাতে ফুরফুরে হাসি আছে, ঝলমলে রৌদ্র আছে, টুকরো টুকরো জুঁই ফুলের মতো মিষ্টি কান্না আছে, আর সব কিছুকে ছাপিয়ে আছে আশ্চর্য্য একটি কৌতুক রসের আলতো আবরণ। সাত বছরের নাতনীকে উদ্দেশ করে কবি এই বইয়ের গল্পগুলি বলে গেছেন মজলিসী দাদামহাশয়ের মতো এবং আপন আনন্দে বলে গেছেন বলেই তাতে জমে উঠেছে অপূর্ব্ব একটা স্বচ্ছতার আমেজ। গেছো বাবার বিচিত্র মাহাত্ম্য বা হাঁচিয়ান্দিনী কুরুকুনার কাহিনী কার না ভালো লাগবে? কবির আপন হাতে আঁকা ছবিগুলি এর গল্পের

ভিয়ানে যে নূতন রসের যোগান দিয়েছে, তাও লক্ষ্য করার মতো। তবে জায়গায় জায়গায় রচনার ভঙ্গী একটু উঁচুদরের হয়ে পড়েছে, হয়ত ছোটরা নাগাল পাবে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের রসানুভূতি কোথাও ব্যাহত হবে এমন আশঙ্কা নেই। পঠিত সাহিত্যের প্রত্যেকটি কথা তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে বুঝতে না পারারও একটা বিশেষ উপকার আছে এই বয়সে—তা হল নিজের কল্পনা দিয়ে ফাঁক ভরিয়ে নেবার অভ্যাস হওয়া। এতেই শিশুর মনে উদ্ভাবনী শক্তি দানা বাঁধে, যা পরে অভিব্যক্তি পায় শিল্প-সৃষ্টির ভেতর দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'সে' সেদিক থেকে আদর্শ শিশুসাহিত্য। অবনীন্দ্রনাথের 'বুড়ো আংলা' ছাড়া এর জুড়ী বই বাংলা ভাষায় আর আছে কি না সন্দেহ!

পাঠ্যপুস্তক নামে শিশুরা বিদ্যালয়ে যে নীরস নিষ্প্রাণ বইয়ের বোঝা প্রতিদিন বইতে বাধ্য হয়, তা দূর করার জন্যেও রবীন্দ্রনাথ যে এক সময় কিছু শ্রম করেছিলেন, একথা বোধহয় অনেকে জানেন না। আশ্চর্য্যের কথা যে তাঁর স্বনামে প্রকাশিত 'অনুবাদ চর্চ্চা', 'ইংরেজী সোপান', 'সহজ সংস্কৃতপাঠ' ইত্যাদি বই এখনো বাজারে খুঁজলে পাওয়া যায়। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের রাজ্যে উল্লেখযোগ্য লেখা হল তাঁর 'সহজ পাঠ'। একবারে বর্ণপরিচয় ও বানান শিক্ষা থেকে সুরু করে, যুক্তাক্ষর বিন্যাস ও মিশ্রবাক্য রচনার প্রণালী পর্য্যন্ত ভাষা ও ভঙ্গী শিক্ষার প্রায় সবগুলি পর্ব্বকেই তিনি এই পাঠমালায় নূতন ভাবে পরিবেষণ করেছেন—সেই পরিবেষণ একদিকে যেমন শিশু-মনের ক্রম-বিকাশ পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর সুস্পষ্ট সজাগতার, অন্যদিকে তেমনি বিচিত্র শব্দ ও বাক্য মালা নিয়ে যথেচ্ছ ভাবে খেলা করার অদ্ভুত দক্ষতা প্রমাণিত করে। সহজ পাঠের অন্তর্গত 'আমাদের ছোট নদী',

শিশু সাহিত্য

'কুমোর পাড়ার গোরুর গাড়ী', 'অঞ্জনা নদীতীরে' প্রভৃতি কবিতার চেয়ে ভালো শিশুকবিতা ব্লেক, ষ্টিভেনসন, ডি-লা-মেয়ার বা কিপলিংও লিখেছেন কিনা সন্দেহ। সহজ পাঠ দিয়ে যারা ভাষা শিক্ষার প্রথম পাঠ পাবে, তারা শিক্ষার সঙ্গেই পাবে আনন্দ এবং এদেশের জীবনে তার মূল্য বড় কম নয়।

ইংরেজী রচনা

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী রচনা সম্বন্ধেও অল্প একটু আলোচনা দরকার। বহির্বিশ্বে তাঁর যে খ্যাতি, তার মূলে আছে হয় তাঁর রচনাবলীর স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ, নয় অন্য কোন ভাষায় সেই অনুবাদের অনুবাদ। এমন কি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় তাঁর গ্রন্থাবলীর যে অনুবাদ হয়েছে, তাও বেশীর ভাগ স্থলেই হয়েছে ইংরেজী অনুবাদ আশ্রয় করে। যদি আপন রচনাবলী কবি ইংরেজীতে ভাষান্তরিত না করতেন, তাহলে নোবেল প্রাইজ পাওয়া এবং তার ফলে সারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ভারত আজ জগতের বিদ্বৎসভায় যে স্থান অধিকার করেছে, তার কথা হয়ে থাকতো স্বপ্নের মতো অলীক। এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষেও তাঁর এবং বঙ্গসাহিত্যের কোন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ হত কিনা সন্দেহ! কাজেই রবীন্দ্রনাথ যে ইংরেজীতে তাঁর রচনা অনুবাদ করতে বসেছিলেন, সেটা একই সঙ্গে তাঁর এবং বাংলা ভাষার দিক থেকে একটা অদ্বিতীয় ঘটনা।

কবির ইংরেজী রচনার গোড়ার ইতিহাসটি বেশ কৌতুকোদ্দীপক। তৃতীয় বার ইংলণ্ড যাত্রার আগে শিল্পী উইলিয়াম রোটেনষ্টাইন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা এক পত্রে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর রচনাবলী সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই কবি যাত্রা-পথে জাহাজে বসে বসে গীতাঞ্জলি, খেয়া,

নৈবেদ্য প্রভৃতির কতক কতক কবিতা ইংরেজী গদ্যে অনুবাদ করেন। নিজের ইংরেজী রচনা সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনে কোন আস্থা বা বিশ্বাসই ছিল না, কিন্তু এই অনুবাদ পড়েই যখন ইয়েটস, ট্রেভেলিয়ন, মে্যা সিনক্লেয়ার প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরেজ সাহিত্যিক মুগ্ধ হলেন, শুধু মুগ্ধ হওয়া নয়, তাঁদের উদ্যোগে যখন এই রচনাগুলি পুস্তকাকারে গ্রথিত হল, তখন তিনি নিজেই অবাক হলেন। বলা বাহুল্য এই বইই হল তাঁর ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' এবং এর জন্যেই তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। চিত্রা, সোনার তরী, চৈতালী, পলাতকা প্রভৃতির কবিতা থেকেও সুনির্ব্বাচিত অনুবাদ প্রকাশিত হয় এর পরে—তা Lover's Gift & Crossing, Fugitive প্রভৃতি বইয়ে সংগৃহীত হয়েছে। কণিকার কতক কবিতা Stray Birds-এ এবং শিশু ও শিশু ভোলানাথের কবিতা Crescent Moon-এ স্থান পেয়েছে। এ ছাড়া বিসর্জ্জন, মালিনী, রাজা ও রাণী প্রভৃতি নাটকও তিনি ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন। আর ডাকঘর, রক্তকরবী, ঘরে বাইরে, গোরা ও গল্প-গুচ্ছের কতক গল্পের অনুবাদ করেন অন্যেরা। ছিন্নপত্রের অনুবাদ হয়েছে Glimpses of Bengal, জীবনস্মৃতির My Reminiscences, আর Personality, Sadhana, Religion of Man প্রভৃতি প্রবন্ধ সমষ্টি কোন নির্দ্দিষ্ট বই বা রচনা থেকে অনূদিত না হলেও, 'শান্তি নিকেতন', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'সমূহ' প্রভৃতির বিখ্যাত প্রবন্ধগুলোই ভাষান্তরিত, কতক ক্ষেত্রে ভাবান্তরিত হয়ে এই সব বইয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। অনেকে হয়ত জানেন যে এই সব প্রবন্ধ প্রথমে হাভার্ড বক্তৃতা ও হিবার্ট বক্তৃতা রূপে ইঙ্গ-মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত হয়েছিল। ইংরেজীতে মূল লেখা সম্ভবত তাঁর দুটি, Nationalism

বইয়ের অন্তর্ভুক্ত বক্তৃতা মালা, আর অ্যালেন আন উইন কর্ত্তৃক প্রকাশিত Child নামক গদ্য কবিতার বই।

এই হল মোটের ওপর তাঁর ইংরেজী রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এর মধ্যে কবির স্বকৃত বাংলা কবিতার গদ্যানুবাদই বাইরে সর্ব্বাধিক সমাদৃত হয়েছে এবং তার বিশেষত্বই সর্ব্বাধিক লক্ষনীয়। এই ছন্দায়িত গদ্য কবিতা গুলির মধ্যে এমন একটা সহজ স্বাচ্ছন্দ্য পরিস্ফুট হয়েছে, যাতে বাংলা না-জানা পাঠকের কাছে এরা পূরোপূরি মূল কবিতা রূপেই প্রতিভাত হয়। কি শব্দবিন্যাসের দিক থেকে, আর কি রসসৃষ্টির দিক থেকে,এদের ভেতর অনুবাদের আড়ষ্টতা কোথাও দেখা যায় না। ইংরেজী রচনার ওপর স্বাভাবিক অধিকার কতখানি থাকলে, তবেই এ ব্যাপার সম্ভবপর, তা আশা করি আর বুঝিয়ে বলতে হবে না।

কিন্তু নিজস্ব ভাবে কবির ইংরেজী রচনার বৈশিষ্ট্য স্বীকার্য্য হলেও তাঁর স্বকৃত অনুবাদের বিরুদ্ধে একটা নালিশও আছে। তিনি প্রায় সর্ব্বত্রই মূলের ভাবার্থ ইংরেজীতে নূতন করে লিখেছেন, কোন ক্ষেত্রেই মূলের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি—বেশীর ভাগ স্থলেই মূলের অনেকাংশ ছেঁটে ফেলেছেন. নয়ত ইংরেজী ভাষার সহজ প্রণবতার সঙ্গে খাপ খাওয়ানের জন্যে মূল বহির্ভূত কিছু কিছু প্রসঙ্গ কোন কোন কবিতায় ইতস্তত সংযোজিত করেছেন। তার ফলে ইংরেজী রচনা হিসাবে তাদের উৎকর্ষ হয়ত বেড়েছে, কিন্তু অনুবাদ হিসাবে তাদের সার্থকতা গেছে রীতিমতো কমে। কাজেই ইংরেজীর মধ্যে দিয়ে যাঁরা রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুসরণ করেছেন, কিংবা ইংরেজী অনুবাদ অবলম্বন করে যাঁরা অন্য কোন ভাষায় তার পুনরনুবাদ করেছেন, তাঁরা

পেয়েছেন ইংরেজী লিখিয়ে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়—বাংলা ভাষায় তাঁর দানের বৈশিষ্ট্য বা তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্য তাঁরা বিশেষ কিছুই জানতে পারেন নি। সেই জন্যেই রবীন্দ্রনাথের স্বকৃত অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায়, বিশেষত ভারতের নানা প্রাদেশিক ভাষায়, তাঁর রচনাবলীর বিশ্বস্ত অনুবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তাঁর ইংরেজী রচনার বাইরে সমাদর হয়েছে, তার কারণ তাতে বিদেশী পাঠক ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম্মবাণীর সন্ধান পেয়েছেন—বিংশ শতাব্দীর শিল্প-বিপ্লব ও যন্ত্র-তান্ত্রিকতা বিব্রত ইউরোপের কাছে তার মূল্য সেদিন কম ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের রচনাশৈলী, তার অলঙ্করণ ও বাকবিন্যাসের চাতুর্য্য কিছুই ধরা পড়েনি তাঁর ইংরেজী লেখায়। তাঁর ইংরেজী রচনার সমাদর সম্বন্ধে এণ্ড্রুজ অবশ্য আর একটা কারণও উল্লেখ করেছেন—তাঁর ইংরেজী কবিতায় ইংরেজী বাইবেলের সুর ও ধরণ সুস্পষ্ট বলেই নাকি ইউরোপীয় পাঠক তার প্রতি এতটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুবাদের ভঙ্গীটা বাইবেলের অন্তর্গত Book of Psalms-এর অনুরূপ, সেটা অবশ্য লক্ষ্য করার বিষয়, কিন্তু কবি নিজে বলেছেন যে গীতাঞ্জলি অনুবাদের আগে তিনি বাইবেল পড়েন নি, এবং তাঁব কথা অতথ্য বলে মনে করবার কোনই হেতু নেই।

দর্শন

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই আমরা কিছু আলোচনা করেছি। এখানে আরো কয়েকটি কথা বলবার চেষ্টা করবো। পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীলদের মতোই রবীন্দ্রনাথেরও জগৎ, জীবন এবং পরমার্থ সম্বন্ধে নিজস্ব কতকগুলি মতবাদ ছিল—এই মতবাদগুলির আলোকেই তাঁর দার্শনিকতার বিচার করতে হবে। কাণ্ট বা হেগেল যে হিসাবে দার্শনিক, রবীন্দ্রনাথ যে সে হিসাবে দার্শনিক নন, এ কথা আশা করি সকলেই জানেন। তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে দৃষ্টি ও অনুভূতি, যার অন্তঃপ্রেরণায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যকে, তাই হল তাঁর দর্শন। বস্তুত এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে যদিও রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞান, ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ব, শিক্ষা, সব কিছু নিয়েই চূড়ান্ত আলোচনা করেছেন, তবু তিনি প্রধানত এবং প্রথমত কবি—তাঁর কবি-মনের স্বাভাবিক প্রবণতাই হল অনুভূতি ও কল্পনার ভেতর দিয়ে সমস্ত ব্যাপারকে দেখা, আর সেই দেখার ঐশ্বর্য্য অন্যের সাম্নে উদ্ঘাটিত করে দেওয়া—তাই তাঁর নানামুখী মত ও চিন্তার মধ্যেই দৃষ্টিগত একটি নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যই হল তাঁর দর্শনের আদি-সূত্র।

রবীন্দ্র-দর্শনের সেই আদি-সূত্রটি কি? আগেই বলেছি যে জগৎ, জীব ও পরমার্থ এই তিনের স্বরূপ ব্যাখ্যান, এবং তাদের পরস্পরের

মধ্যে সম্বন্ধ-নির্ণয়ই হল সমস্ত দর্শনের উপজীব্য (অবশ্য সমস্ত আস্তিক্য-বাদী দর্শনের এবং রবীন্দ্রনাথ আস্তিক্যবাদীই), রবীন্দ্রনাথের দর্শনেও এই তিনেরই ব্যাখ্যান এবং বিশ্লেষণ দেখতে পাই। একে একে এদের কথা বলি।

প্রকৃতিকে রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন অখণ্ড প্রাণশক্তির মূলাধার রূপে—ক্ষুদ্রতম প্রাণকণিকা থেকে আরম্ভ করে বৃহত্তম জৈবসত্তা পর্য্যন্ত, সমস্তই সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির ধারায় উৎসারিত হয়েছে এই আদি জীবন-ভূমি থেকে। প্রকৃতির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যে দিয়ে উদ্বেলিত হচ্ছে যে দুর্নিবার প্রাণলীলা—যা বীজ থেকে বৃক্ষে, বৃক্ষ থেকে ফুল-ফলে, তা থেকে আবার বীজে অবিশ্রাম রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রেখে চলেছে—দিন ও রাত্রির পরিবর্ত্তন, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও বসন্তের আবর্ত্তন এই রূপান্তরের পথে আনছে যে নব নব পরিণতির প্রকাশ—একে রবীন্দ্রনাথ একটা মূঢ় শক্তির ক্রিয়া বলে গ্রহণ করেন নি। এর মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন একটি প্রাণময় পরম সত্তার অবস্থিতি, যা নানা খণ্ড-অভিব্যক্তির ভেতরও এক এবং অখণ্ড। এই যে সৃষ্টি প্রপঞ্চ, এই যে এর প্রতি মুহূর্ত্তের ভাঙাগড়া—এ আকস্মিক নয়, যেমন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও সহসা উদ্ভূত একটা বিচিত্র বস্তু নয়। এর পেছনে রয়েছে নিত্য ক্রিয়াশীল, নিত্য মননশীল সেই পরম প্রাণশক্তি—তারি নির্দ্দেশে চলছে ফিরছে এই জগৎ—নানা রূপে ফুটে উঠছে, ভেঙে পড়ছে, আবার সেই ধ্বংসের ভেতর থেকেই জেগে উঠছে নূতন জীবনাঙ্কুর—এর শেষ নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে এ একটা লীলা এবং এই লীলাকে তিনি ভাগবতী লীলা রূপেই স্বীকার করেছেন।

জড়বিজ্ঞান যে evolution-কে স্বীকার করে, তাতেও প্রাণ-শক্তির

এই অফুরন্ত রূপান্তরকেই আশ্রয় করা হয়েছে —কিন্তু তার কেন্দ্রস্থানে রয়েছে মূঢ় কার্য্য-কারণ সম্বন্ধের খেলা। সেই বিজ্ঞান-সম্মত কাঠামোর ওপরই রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ব-তত্ত্ব সংস্থিত, কিন্তু একে তিনি তাঁর নিজস্ব ভাব-কল্পনায় অভিষিক্ত করে নূতন একটি মতবাদে পরিণত করে নিয়েছেন। এই মতবাদকে অনেকে বার্গসোঁ প্রচারিত Creative evolution-এর সগোত্রীয় বলে মনে করেছেন—কেউ বা বলেছেন, এর মূল শেলীর কাব্য। অনেকে আবার এর ভেতর উপনিষদের ছায়াও লক্ষ্য করেছেন। বস্তুত এ তিনেরই সঙ্গে রবীন্দ্র-দর্শনের কিছু কিছু সাদৃশ্য দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে একে অনুকৃতি বা অনুসরণ বলা যায় না। প্রকৃতির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুকে ব্যাপ্ত করে বয়ে চলেছে যে অখণ্ড একটি প্রাণের খেলা, তা নিরুপাধিক কোন বৈদ্যুত-চেতনার খেলা নয়—সে হল চিরসুন্দর, চিরমঙ্গল, চিরধ্রুব সেই পরমাত্মার লীলা, যে লীলা স্থূল রূপে প্রকট এই বিচিত্র জগৎ-ব্যাপারের ভেতর দিয়ে, আবার সূক্ষ্মরূপে অভিব্যক্ত এর অন্তর্নিহিত সঞ্জীবন ক্রিয়ায়—এ মত রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব নয়, কিন্তু এই মতকে তিনি যে নূতন ব্যঞ্জনা দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন, তা তাঁরি সৃষ্টি এবং সেইখানেই তাঁর নিজস্বতা।

আমাদের সসীম জীবন ও তার অন্তর্লগ্ন সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহ, জন্ম-মৃত্যুকে রবীন্দ্রনাথ চরমাবস্থা বলে গণ্য করেন নি। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতিকে বেষ্টন করে আবর্ত্তিত হচ্ছে যে অসীম প্রাণলীলা, এই যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিকাশ, এ তাঁর মতে সেই অপার প্রাণ-সমুদ্রের বুকে ফুটে-ওঠা এক একটা বুদ্বুদের মতো—যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই আছে তাদের আত্মস্বতন্ত্র অস্তিত্ব, কিন্তু যেই ভেঙে যাচ্ছে, অমি তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছে সেই বিরাট প্রাণ-স্রোতে। এই জন্যেই যখন তিনি প্রেমসঙ্গীত

রচনা করেছেন, যখন এঁকেছেন মৃত্যুর ছবি, বাস্তব জীবনের বেদনা-বঞ্চনা আঘাত-অবমাননাকে যখন ভাষা দিয়েছেন, তখন এদের তিনি নির্ব্বিশেষ রূপে উপস্থিত করেন নি—এদের পেছনে রয়েছে যে অম্লান সার্থকতা, অপূর্ব্ব সম্পূর্ণতা, তার দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়েই তিনি এই আপেক্ষিক অভিব্যক্তি গুলিকে রূপায়িত করেছেন। তাই আমাদের বৈষয়িক দৃষ্টিতে দেখলে, অনেক সময় মনে হতে পারে যে বাস্তব জীবনকে তিনি তার প্রত্যক্ষ আবেষ্টনী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেছেন। অর্থাৎ বাস্তবতার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দর্শনকে সব সময় আমরা সহজ মনে মেনে নিতে পারি কিনা সন্দেহ!

কিন্তু এইখানে বলে রাখা দরকার যে বাস্তব সংসার এবং তার প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, আঘাত-সংঘাত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সজাগ অভিজ্ঞতা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টিরও অভাব ছিল না। চরম সত্য ও পরম ঐক্যের দিক থেকে বিচার করলে এদের স্বরূপ যাই হক, নিজস্ব ভাবে এরা মিথ্যা নয়—মানুষের কাপট্য, স্বার্থপরতা, ইতরতা, ঈর্ষা বা আর যা-কিছু অনাচার সমাজ-জীবনে এনেছে অনৈক্য ও অশান্তি, তিনি তার বিরুদ্ধে উদাত্ত কণ্ঠেই প্রতিবাদ ঘোষণা করেছেন, এমন কি বিদ্রোহ ঘোষণাতেও পেছপা হন নি। জরা, মৃত্যু, ক্লৈব্য, অক্ষমতা যেখানে জীবনের স্বাভাবিক গতির ও সহজ মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করে দাঁড়িয়েছে, সেখানে তিনি দিয়েছেন সাহস ও সহানুভূতির, শান্তি ও সাম্যের অনুপ্রেরণা। বৈদান্তিক নির্লিপ্ততায় তাবৎ পার্থিব ব্যাপারকে মায়া মাত্র বলে উড়িয়ে দেন নি তিনি—মানুষের প্রাকৃতিক ও মানবিক দুর্ভাগ্যগুলিকে মানুষের মতোই তিনি গ্রহণ করেছেন এবং এ সবের উর্দ্ধে অবস্থিত যে শাশ্বত সত্যের রাজ্য, তার আশ্রয়ভ্রষ্ট হয়ে মানুষ যে

কি ভাবে মানুষের হাতে নিপীড়িত হচ্ছে, তাও তিনি অকপট আন্তরিকতার সঙ্গেই অঙ্কিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন, কি ভাবে মানুষ সভ্যতার নামে ক্রমাগত তার লালসাকেই বাড়িয়ে চলেছে একের পর এক উপকরণ সৃষ্টি করে এবং সেই সমস্ত উপকরণের দাসত্বে দিনে-দিনে কি ভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে অন্তরের দিক থেকে নিঃস্ব হচ্ছে। এই যে অন্যকে চেপে রেখে নিজে বড় হয়ে ওঠবার প্রচেষ্টা এবং তার জন্যে সংসার-জীবনের শালীনতা ও শ্রী নষ্ট করা—সমাজে অনৈক্য, অশান্তি ও অত্যাচারকে স্বাগত করে আনা, এ তাঁর মতে তথাকথিত যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতিক্রিয়া। এ বস্তুর সঞ্চয়ে স্ফীত, এতে নেই অন্তরের ঐশ্বর্য্য, তাই একে তিনি বর্জ্জন করতে বলেছেন। বলেছেন, আবার সেই ভাব-সমৃদ্ধ অতীতের জীবনাদর্শকে জাগিয়ে তুলতে, যাতে থাকবে না উপকরণের বাহুল্য, যা বিস্তার করবে না অশিষ্ট লোভের অনতিক্রমণীয় নাগ-পাশ। মানুষ তার যন্ত্রবদ্ধতা থেকে মুক্তি পাবে, মুক্তি পাবে কু-অভ্যাস ও কদাচারের দাসত্ব থেকে এবং তার ভেতরকার অমৃতত্ব, বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র প্রাণলীলার সঙ্গে তার নিত্য ক্রিয়াশীল যোগ-সূত্রটি আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এই হল তাঁর দর্শনের শেষ কথা। এই কথা অনেকের কাছে হয়ত অপ্রগতিশীল মনে হবে—জীবনের বাস্তব পরিণতিকে অস্বীকার করে, রবীন্দ্রনাথ তাকে একটা রোমান্টিক স্বর্ণযুগের পটভূমিতে নিয়ে গিয়ে স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিলেন বলেও হয়ত অনেকে মনে করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটাই সব চেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা যে বস্তু-বিজ্ঞানের কল্যাণপ্রদ অগ্রগতিকেও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ এবং স্বীকার করেছিলেন।

ধর্ম্ম

ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং পিতা দেবেন্দ্রনাথ ও অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাবে বাল্য থেকেই তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদের প্রবর্ত্তনা। তাঁর সমস্ত জীবনের সাহিত্যেই উপনিষদের প্রভাব সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করা যায়। তাঁর বিশ্বমৈত্রী, তাঁর সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি, তাঁর আনন্দবাদ, সবই এসেছিল উপনিষদ থেকে। কিন্তু তিনি কেবল মাত্র বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদেই তাঁর মননধারা আবদ্ধ রাখেন নি—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের এবং বৌদ্ধ ও খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাবও তাঁর ওপর পূর্ণ ভাবেই পড়েছিল। উত্তর ভারতীয় সন্তদের এবং বঙ্গীয় বাউলদের প্রভাবও কম পড়েনি।

তাঁর কান্তাভাবের গান ও কবিতাগুলির মধ্যে পাওয়া যায় বৈষ্ণব গীতিকবিতার ছায়া। সেই পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, ভাব-সম্মেলন বাসক-সজ্জা, মিলন, বিরহ—আর যা-কিছু আদর্শ বৈষ্ণবীয় ভাব-কল্পনার আশ্রয়, তারা তাঁর কাব্যে নবরূপে প্রতিভাত হয়েছে। ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে রুদ্রকে, সৃজনের মধ্যে দিয়ে শক্তিকে তিনি বার বার উপলব্ধি করেছেন—বাণীরূপে, সারদারূপে, লক্ষ্মীরূপে মাতৃত্বের বিভিন্ন পর্য্যায়-কেও তিনি স্বীকার করেছেন নানা জায়গায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের নীতি-বিশুদ্ধি, খৃষ্টধর্ম্মের আত্মসমর্পণও তাঁতে পূর্ণ মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু ইসলামের কোন প্রত্যক্ষ ছায়া তাঁতে পাওয়া যায় না, যদিও প্রেমকাব্যে সুফীদের সঙ্গে মাঝে মাঝে তাঁর ভাবসাদৃশ্য পাওয়া যায়।

এ থেকে কথা এই দাঁড়ায় যে ব্রাহ্মরূপে কবির যে পরিচয়, সে তাঁর পারিবারিক পরিচয়—তাঁর ভাবিক জীবন ও চিন্তাধারায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়ের একটি অপূর্ব্ব পরিণতিই লক্ষ্য করা যায়। শান্তিনিকেতন পর্য্যায়ের ধর্ম্ম-ব্যাখ্যানে বা নৈবেদ্যের কতক কবিতায় বা কতকগুলি ব্রহ্মসঙ্গীতে অবশ্য তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মকেই সজাগ ভাবে প্রচার করেছেন—বাক্য-মনের অগোচর যে পরমার্থ জগৎ ও জীবের ভেতর অদৃশ্য চেতনাকারে বিদ্যমান থেকে, নব নব রূপে অভিব্যক্ত হয়ে চলেছেন—তিনি কখনো রুদ্র, কখনো কান্ত, কখনো আনন্দময় পরম পূর্ণতা, কখনো প্রাণময় পরম সার্থকতা—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারকে পরিব্যাপ্ত করেই রয়েছেন তিনি, তিনিই স্থূল রূপে এই জগৎ-প্রপঞ্চ, আবার দিব্যরূপে এর আত্মা—এ কথা তিনি বহুবারই বহু প্রকারে বলেছেন।

কিন্তু এই পরম সত্তাকে নির্ব্বিশেষ নিরুপাধিক করে রবীন্দ্রনাথ কখনো গ্রহণ করেন নি, এঁকে ব্যক্ত করার জন্যে পদে পদেই নিয়েছেন প্রতীকের আশ্রয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চলে এসেছেন পৌত্তলিকতার এলাকায়। অরণ্যের মধ্যে যে প্রাণশক্তি, তাকে তিনি গ্রহণ করেছেন অরণ্যলক্ষ্মী রূপে—সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয়তা, তাকে তিনি এঁকেছেন সুন্দরের দূতরূপে, মিলনোৎসুক প্রেমিকরূপে—মৃত্যুর মধ্যে, ধ্বংসের মধ্যে যে ভয়ঙ্করতা, তাকে তিনি অনুভব করেছেন নৃত্য-উন্মাদ নটরাজ রূপে। এই যে প্রতীকাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গী, একে পৌত্তলিকতাই বলা যাবে। এমন কি বিধিবদ্ধ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম্মের পরিচিত প্রতীকগুলিকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন নি। দু-একটা দৃষ্টান্ত দিই—

অন্নপূর্ণা মা আমার নিয়েছ বিশ্বের ভার
সুখে আছ সর্ব্বচরাচর।

মোরে তুমি হে ভিখারী মা'র কাছ হতে কাড়ি
করেছ আপন অনুচর।

কিংবা—

পথে পথে রচি আলিম্পনের রেখা
পাথার কাঁপনে গগনে গগনে
উচ্ছ্বসি উঠে দিক-প্রাঙ্গণে
বহ্নিচক্র রেখা,
প্রথম পরমবাণী—
বীণা হাতে বীণাপাণি।

কিংবা—

এসোগো শারদ লক্ষ্মী তোমার
শুভ্র মেঘের রথে—
এসো নির্ম্মল নীল পথে।
এসো ধৌত শ্যামল
আলো ঝলমল
বন গিরি পর্ব্বতে।
এসো মুকটে পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা।

কিংবা—

প্রলয় নাচন নাচলে যখন
আপন ভুলে,
হে নটরাজ নটরাজ
জটার বাঁধন পড়লো খুলে।

জাহ্নবী তায় মুক্তধারা,
উন্মাদিনী দিশেহারা,
সঙ্গীতে তার তরঙ্গদোল
উঠলো দুলে !

এই কবিতাংশ গুলির ভেতর দিয়ে যে কবি-দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই, তা ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকের দৃষ্টি নয়—তা লীলাবাদী পৌত্তলিকের দৃষ্টি এবং এ দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সহজাত। জন্মভূমিকে তিনি দেখেছেন অন্নপূর্ণা রূপে।—

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য,
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন,
জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা
পূণ্য পীযুষ স্তন্যবাহিনী।

ঘনান্ধকার অমারাত্রিকে তিনি দেখেছেন রক্তবীজ বধে নিরত উন্মাদিনী কালিকা রূপে—

আঁধার কুন্তল তোরে মহাশূন্য জুড়িয়া,
প্রলয়ের কালো ঝড়ে বেড়াইবে উড়িয়া,
অন্ধকারে দিশাহারা কম্পমান গ্রহতারা
চরণের তলে আসি ভেঙে যাবে গুঁড়ায়ে
দিবি সেই বিশ্ব-চূর্ণ নিশ্বাসেতে উড়ায়ে !

তাঁর এই পৌত্তলিকতা সব চেয়ে বেশী পরিস্ফুট হয়েছে প্রেমকাব্যে, যেখানে সমস্ত পটভূমিকে অধিকার করে রয়েছে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম পরিকল্পনা—বৈষ্ণবীয় মধুর ভাবের সেই কবিতাগুলিকে অবশ্য খৃষ্টীয় প্রেমকাব্যের প্রেরণা সঞ্জাত বলেও ব্যাখ্যা করা যায়—কিন্তু বহু স্থানে

কবি প্রকাশ্য ভাবে কৃষ্ণ-কাহিনীর অবতারণা করেই সেই সন্দেহের নিরসন করে দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সম্ভবত তা অনাবশ্যক। এ থেকে এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে রবীন্দ্রনাথ পৌত্তলিক হিন্দু ছিলেন—সঙ্গে সঙ্গেই বলা যেতে পারে, তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বা মরমী ছিলেন বা খৃষ্টান ছিলেন। এমন কি প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ-শক্তি আরোপ করে বা সৃষ্টিমূলক অভিব্যক্তির অনুপূরক রূপে জীবনের ব্যাখ্যা করে তিনি যে আর একটি দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে তাকে নিরীশ্বরবাদীও বলা কঠিন নয়। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের মতো বিদগ্ধ কবির চিত্তে নানা সময়ে নানা সংস্কৃতির প্রভাব এসেছে—অনেক সময় একের সঙ্গে তার অন্যের প্রত্যক্ষ কোন যোগও হয়ত থাকে নি, কিন্তু অনুভূতির গভীরে সব শুদ্ধ জড়িয়ে একটা অপূর্ব্ব সমন্বয় হয়েছিল—সেই সমন্বয়ই হল তাঁর ধর্ম্মতত্ত্বের গোড়ার কথা।

কিন্তু ধর্ম্মমত এক জিনিষ, বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ আর এক জিনিষ। এই প্রয়োগের ওপরই দাড়িয়ে আছে সমাজ-জীবন এবং তা থেকেই এসেছে প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ। ধর্ম্মের এই প্রত্যক্ষ বা ফলিত অংশ যেটা, সাধারণের কাছে তা-ই ধর্ম্ম বলে গৃহীত। সে দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অবলম্বন এবং অভিমত কি ছিল, সেটা এখানে বলা দরকার। আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবতা বোধের সমর্থক ছিলেন—কাজেই মানুষে-মানুষে ভৌগলিক, ধর্ম্মনৈতিক বা সামাজিক ভেদকে তিনি স্বীকার করতেন না। মন্দির, মসজিদ, গির্জ্জা, ফলক, গ্রন্থ—সব কিছুর সার্থকতাই তিনি স্বীকার করতেন, মানুষের নৈতিক বিশুদ্ধি ও চারিত্রিক উন্নয়নের জন্য এদের উপযোগিতাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুমোদনও করতেন, কিন্তু তাঁর মত ছিল যে এই

সমস্ত জিনিষ হল লক্ষ্যে পৌছুবার উপ-লক্ষ্য মাত্র—এদেরকেই যেন চরম বা পরম বলে মনে না করা হয়। দুর্ভাগ্য বশত বাস্তব জীবনে আমরা তাই করি—তাই পান-ভোজন, আদান-প্রদান, ছোঁয়া-নাড়া বা আর যা-কিছু সামাজিক ব্যাপার, তার মধ্যে আমরা এদের টেনে আনি এবং এদের আসল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হয়ে ক্ষুদ্র আনুষঙ্গিক গুলো নিয়ে পরস্পর হানাহানি করে মরি। রবীন্দ্রনাথের মতে এ ধর্ম্ম নয়—মানুষের যা ধর্ম্ম, তা হল মহৎ, তা হল কল্যাণপ্রদ, তা হল সর্ব্বমানবের মধ্যে একত্ব স্থাপনের উপায়ভূত। সমস্ত উপধর্ম্মই জন্মেছে সেই আদি ও অকৃত্রিম ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কিন্তু বিবেচনাহীন মূঢ়তা ও কুসংস্কারের উৎপাতে তা ক্রমে ক্রমে হয়ে দাঁড়িয়েছে কতকগুলি সম্প্রদায়ের সংরক্ষিত স্বার্থ স্বরূপ এবং তারি প্রভাবে সমাজ-জীবন হয়েছে বিপর্য্যস্ত। এ জন্যে তিনি যত আঘাত করেছেন খৃষ্টানকে, তত আঘাতই করেছেন হিন্দু-মুসলমানকে—যদিও প্রত্যেকটি ধর্ম্ম সম্বন্ধেই তাঁর অন্তরে ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ এবং প্রত্যেকটিকেই যথাশক্তি অনুসরণও করেছিলেন তাঁর ভাব-জীবনে।

রাজনীতি

রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি এক হিসাবে তাঁর সমাজনীতিরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ প্রত্যক্ষ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নির্ব্বিশেষ পলিটিক্সের চর্চ্চা তিনি করেন নি—সমাজজীবনের উন্নয়ন ও কল্যাণের উপায় হিসাবেই তিনি স্বীকার করেছিলেন রাজনীতিকে। তাই তাঁর রাজনীতিতে আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদ নেই—বরং সেই ধরণের জাতীয়তাবাদের বিরোধী রূপেই তাঁর প্রসিদ্ধি। তিনি চেয়েছিলেন, এদেশের লোক জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সুশিক্ষা লাভ করবে, ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্পে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সমমর্য্যাদায় অভিষিক্ত হবে।

এই পরিকল্পনার সাফল্যের পথে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন দুটো প্রচণ্ড বাধা—এক পরকীয় শাসন ব্যবস্থা ও তার অনুগামী শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভুত্ব, আর অপ্রগতিশীল প্রাচীনপন্থীতা ও তার আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠান, তাই তিনি এ দুইয়েরই বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে-ছিলেন। পাশ্চাত্য জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, তাদের সাহস, সত্যনিষ্ঠা, উদ্যম ও উদ্ভাবনী-শক্তিকেও তিনি অনুকরণীয় বলে স্বীকার করতেন—তাই তিনি বৈদেশিক সংস্রবকে কোন দিনই অবাঞ্ছনীয় বলে মনে করতেন না। বরং এ-দেশের অনড় একগুঁয়ে রক্ষণশীলতাকে ও-দেশের প্রাণবন্ত সংস্কৃতির সংস্পর্শে জাগিয়ে তোলারই তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের পক্ষে বৈদেশিক শাসনের তিনি বিরোধী ছিলেন এবং সে বিরোধিতার কারণ, এই

শাসনের সঙ্গে কল্যাণের যোগ নেই—এ-দেশের শক্তি, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির তা পরিপোষক নয়। বলাই বাহুল্য তিনি জাতি-দ্বেষ সম্পন্ন ছিলেন না বা অন্য দেশ ও জাতির ক্ষয়কে স্বদেশ ও স্বজাতির পক্ষে কল্যাণাবহও ভাবতেন না। সর্ব্বমানবের মধ্যে ভাবিক ও নৈতিক আদান-প্রদানের দ্বারা একটি অখণ্ড মানবগোষ্ঠী গঠনই ছিল তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের লক্ষ্য। যুদ্ধ-বিগ্রহ, শাসন ও নিপীড়নের দ্বারা সমস্ত জাতিকে পরাভূত ও সমস্ত দেশকে কবলিত করে, সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর আপন জাতির গৌরবসৌধ গড়ে তোলার ভয়াবহ আদর্শকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন।

তাঁর এই ঘৃণা প্রকাশ পেয়েছে জার্ম্মাণী, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্য-লিপ্সা থেকে উৎসারিত যুদ্ধ দেখে। ভারত সম্পর্কেও তিনি সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র মতামতই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু তাঁর এই বিরোধিতাকে বৈরিতা বলে মনে করলে ভুল করা হবে। মানুষের মানবিক অধিকারের প্রতিকূল বলেই তিনি বৈদেশিক শাসনকে ঠিক ততটাই আঘাত করেছেন, যতটা আঘাত করেছেন তাঁর স্বাদেশিক সমাজ-ব্যবস্থাকে। এ-দেশের স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি প্রভৃতির ধ্বংস হয়েছে যে কারণে, আর যে কারণে লুপ্ত হয়েছে মানুষের চরিত্র, মর্য্যাদা ও মনুষ্যত্ব, তিনি তার কোনটাকেই ক্ষমার্হ মনে করেন নি।

যে সমাজ ধর্ম্মগত জাতি-বিভাগ প্রবর্ত্তন করে জাতির অখণ্ডতা নষ্ট করেছে এবং একই সম্প্রদায়ের ভেতর রকমারি শ্রেণী নির্দ্দেশ করে, কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীর কায়েমি স্বার্থ সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবশিষ্টদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার হরণ করেছে, অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে অনুপাত রক্ষা করে ব্যবস্থার সংস্কার না করে, অভ্যাসের দাসত্বকেই দিয়েছে

প্রাধান্য এবং তারি সুযোগে ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের খাতিরে বহু অনাচার কদাচার ও অসত্যকে মাথা পেতে নিয়েছে, তিনি সমান নির্ম্মম হস্তে তাকেও শাসন করেছেন। শুধু শাসনই নয়, তাকে সত্য পথেরও সন্ধান দিয়েছেন। তাই তাঁর রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে, সমাজ-নীতির কথাও প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে।

এইখানে তাঁর রাজনৈতিক পরিকল্পনার মোটা কথা আরো দু-একটি বলে রাখা দরকার। এ-দেশের প্রাণকেন্দ্র প্রধানত পল্লীতে নিবদ্ধ—তার চাষ-বাস, গৃহ-শিল্প, বৃত্তি-ব্যবসা ইত্যাদির ওপর ভর দিয়েই সমস্ত দেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে—কিন্তু নাগরিক জীবনের ক্রমস্ফীতি এবং বুদ্ধিমান ও সমৃদ্ধ জনগণের দলে দলে গ্রাম ছেড়ে সহরে চলে আসার ফলে পল্লীর সামাজিক শৃঙ্খলা ক্রমেই বিপর্য্যস্ত হচ্ছে, তার শক্তি এবং সম্পদও হচ্ছে ধীরে ধীরে অন্তর্হিত। এর ওপর আছে মহামারী, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, আরো রকমারি উৎপাত—ইদানীং তারি সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক কলহ। সুতরাং পল্লীর প্রাণ-শক্তি যে আজ কণ্ঠাগত হয়ে উঠেছে তা বলাই বাহুল্য। এদিকে সহরেও জনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যথোচিত পথে শ্রমশিল্পের বিস্তার হয়নি, ফলে সেখানেও দেখা দিয়েছে ব্যাপক বেকার সমস্যা, অবিবাহ এবং আরো নানা সঙ্কট। কাজেই গ্রামে ও নগরে সর্ব্বত্রই আজ দেশবাসীর দুর্দ্দশা চরমে উঠেছে।

এই অবস্থার প্রতীকারে রবীন্দ্রনাথ পল্লীকে পুনর্গঠিত করে তোলার নির্দ্দেশ দিয়েছেন। নদীনিয়ন্ত্রণ করে, বিজ্ঞানসম্মত কৃষি ও সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধানের যুগোপযোগী ব্যবস্থা করে, সর্ব্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যের নব নব পন্থা উদ্ভাবন করে, পল্লী-জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে—তাতে সহরের প্রয়োজনাতীত

জনতা হ্রাস পাবে, গ্রামেরও ক্ষয়িষ্ণু জীবনী-শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথ তাই পল্লীগঠনকে তাঁর রাজনীতির প্রধান অংশরূপে স্বীকার করেছিলেন এবং শিক্ষিত সাধারণের সঙ্গে গণ-সাধারণের সংযোগ স্থাপনের দ্বারা এই পরিকল্পনাকে কাজে খাটাবারও নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কৃষি ও শিল্পবিদ্যা শেখানো, পল্লী সংগঠন, লোকশিক্ষা বিতরণ ইত্যাদির যে সমস্ত আয়োজন হয়েছে, তাতে এই পরিকল্পনাকে যথাসম্ভব রূপ দেবারও চেষ্টা করেছিলেন তিনি।

সাম্প্রদায়িক কলহ আমাদের এ-কালীন রাজনীতির একটি বৃহৎ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর সমাধানেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মননশীলতাকে নিয়োগ করেছিলেন। উভয় পক্ষের সহনশীলতা এবং উদার বুদ্ধিই যে এর সমাধানের একমাত্র উপায়, তা সর্ব্বজন বিদিত, কিন্তু কি করলে সেই সহনশীলতা জন-মনে সঞ্চারিত করা যেতে পারে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, পরস্পর মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ই হল এর একমাত্র উপায়। হিন্দুর সংস্কৃতি যখন মুসলমান সম্যক রূপে উপলব্ধি করবেন, আর মুসলমানের সংস্কৃতি হিন্দু হৃদয়ঙ্গম করবেন, তখন দেখবেন যে ব্যবহারিক আচার-অনুষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যাই থাকুক, সব ধর্ম্মেরই প্রতিপাদ্য এক, লক্ষ্য এক। পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের দরুণ এই ঐক্য-সূত্রটি আমরা ধরতে পারি না, তাই বহিরঙ্গিক পার্থক্যগুলোকে বড় করে তুলে অযথা বিবাদে প্রবৃত্ত হই। এজন্যে দরকার অনুদার এবং আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব পরিহার করে, নিজের নিজের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মনীতির মূলতত্ত্বগুলি অপরাপর সম্প্রদায়ের সামে মেলে ধরা। দেশের শিক্ষায়তনে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, জাতীয় আন্দোলনে, সর্ব্বত্রই

রয়েছে এই অনুদারতা—তার ওপর পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির উদ্দীপনা রয়েছে এর পেছনে, তাই প্রতি পদে পদেই দেশে অশান্তি ধূমায়িত হচ্ছে। দেশবাসীর ধর্ম্মগত পরিচয়কে পারিবারিক জীবনে এবং রাষ্ট্রীক পরিচয়কে জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে, এ উপদ্রব আপনিই তিরোহিত হবে। কিন্তু সেজন্যে অগ্রণী হতে হবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিকেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রাজনীতিক রচনা-বলীর বহু স্থানেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এই ভাবেই এর সমাধানেরও পথ নির্দ্দেশ করেছেন।

সমাজ

দেশের প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার কবি আমূল সংস্কার চেয়েছিলেন। ধর্ম্মের ভিত্তিতে উচ্চ-নীচ অনুসারে ভাগ করা সামাজিক কাঠামোকে তিনি স্বীকার করেন নি। প্রাচীন কালের অবস্থা ও প্রয়োজনের অনুকূলে গঠিত বিধি-বিধানের দাসত্ব করা এবং যুগোচিত পরিবর্ত্তনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠানকে সংশোধন করে না নেওয়ার মনোভাবকে তিনি নির্ম্মম ভাবে আঘাত করেছেন বার বার। যে সমাজ-ব্যবস্থা মানুষকে তার মনুষ্যত্বের জন্যেই মূল্য দেয়নি, দিয়েছে জন্মের জন্যে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় স্বভাবে-সংস্কৃতিতে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলের বড় হয়ে ওঠার পথ যা অবারিত করে দেয়নি—বরং জাতি ভেদের, কৌলীন্যের, বর্ণাশ্রমিক অভিজাত্যের বেড়াজাল পেতে সে পথকে দুরতিক্রম্যই করে রেখেছে, কবি মনে করেছিলেন, আমাদের রাষ্ট্রগত পরাধীনতার চেয়ে তা ঢের বেশী ক্ষতিকর।

ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ থেকেই তিনি এই সংস্কার প্রেরণা পেয়েছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতা এবং মননশীলতারও প্রবর্ত্তনা ছিল। জাতিভেদকে তিনি আমাদের সামাজিক সংহতি লাভের পথে সব চেয়ে বড় শত্রু বলে বুঝেছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, প্রত্যক্ষ ভাবেও এর সংস্কারে অগ্রণী হয়েছিলেন। তথাকথিত বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পান-ভোজন ও বিবাহের প্রবর্ত্তন হলে একদিন স্বাভাবিক নিয়মেই পারস্পরিক ভেদ অপসারিত হতে পারে—একে অন্যের স্বার্থ ও সম্ভ্রম

রক্ষার বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠতে পারে, এই ছিল তাঁর ধারণা। তাই বিশ্বভারতী আশ্রমে তিনি বিভিন্ন দেশ ও জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একত্র পান-ভোজনের প্রথা প্রবর্ত্তন করেছিলেন—পারিবারিক জীবনেও তিনি একাধিক অন্তর্ব্বিবাহ স্বেচ্ছায় দিয়েছিলেন। এদিক থেকে তিনি এমনি একটি উদার ও প্রগতিশীল আদর্শ স্থাপন করেছিলেন, যা সকলকেই উৎসাহিত করেছে।

বলা বাহুল্য মত পোষণ বা প্রচার করা এক জিনিষ, তাকে কার্য্যের মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা আর এক জিনিষ। আমাদের দেশে সংস্কারের প্রয়াস যা হয়েছে, সবই হয়েছে প্রধানত এবং প্রথমত কাগজে-কলমে, তাই বিধবা বিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ যুক্তি-তর্ক বা আইনের দিক থেকে স্বীকৃত হয়েও আজো সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হতে পারেনি। মত হিসাবে আমরা এদের উপযোগিতা স্বীকার করি, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে এদের অনুষ্ঠান যথাসম্ভব সতর্কতার সঙ্গেই বর্জ্জন করে চলি। রবীন্দ্রনাথের মতো স্বাধীনচেতা পুরুষ ত এ ধরণের প্রতারণা করতে পারেন না। তিনি তাই তাঁর একমাত্র পুত্রের বিধবা বিবাহ দিয়েছিলেন, নিজে তিনি রন্ধন ও খাদ্য পরিবেষণের জন্য অন্ত্যজ, এমন কি অহিন্দু ভৃত্য পর্য্যন্ত রেখেছিলেন। ধর্ম্মের নামে, শাস্ত্রের নামে, যুগের প্রয়োজনকে অস্বীকার করে, কোন সুদূর অতীতে যে সমস্ত আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত হয়েছিল, অন্ধভাবে তার আনুগত্য করা যে দেশের রীতি, সে দেশে এই দুঃসাহস বড় কম জিনিষ নয়। কিন্তু এইটুকুই রবীন্দ্রনাথের সমাজ-দৃষ্টির সমগ্র পরিচয় নয়।

আমদের পুরাণো সমাজ-ব্যবস্থায় নারীকে নানা দিক থেকেই রাখা হয়েছিল বিড়ম্বিত করে। তার শিক্ষাকে যথোচিত ভাবে স্বীকার করা

হয়নি, তার স্বাধীনতা, সামাজিক মর্য্যাদা, সর্ব্বোপরি তার মানবিক অধিকার ছিল অন্তঃপুরের চতুঃসীমায় আবদ্ধ। অভিবাক কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত স্বামীকে অপ্রতিবাদে গ্রহণ, তাঁর সংসারের দায়িত্ব প্রতিপালন ও সন্তান ধারণই ছিল নারীর একমাত্র কর্ত্তব্য। এর বাইরে তাকে দেওয়া হয়েছিল একমাত্র অধিকার বৃদ্ধ হলে তীর্থভ্রমণে বের হবার, নয়ত গুরু-গোঁসাইয়ের কাছে ধর্ম্মব্যাখ্যান শুনবার। এ জীবন যে মানুষের পক্ষে অনভিপ্রেত, তা পর্য্যন্ত কারুর মনে হয়নি। বরং অনেকে এর ভেতর প্রাচ্যসুলভ সমাজ-কৌলীন্যেরই পরিচয় পেয়েছিলেন। নারীর এই শোচনীয় দুর্দ্দশার প্রতীকারে প্রথম অবহিত হয়ে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজ—তাঁরাই নারীর শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং নাবালক বয়সে বিবাহ দেওয়া, যথাসময়ের বহু আগেই সংসারের বোঝা কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে তাকে চিরকালের মতো পঙ্গু করে ফেলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তা গ্রহণ করেন নি—এমন কি এই প্রচেষ্টাকে তাঁরা ব্যভিচার বলেই প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম বোঝালেন যে নারী পুরুষের যোগ্য সহচরী হবার অধিকারিণী—তাকে সেই রকম শিক্ষা দিলে, সম্মান দিলে, সে যে সমাজ-জীবনের উন্নয়নে কত বড় অংশ নিতে পারে, তা তাঁর রচনার ভেতর দিয়েই দেশ প্রথম শিখলে।

তিনি বোঝালেন যে মাতারূপে, পত্নীরূপে, সখীরূপে তার যেমন পুরুষের প্রতি কর্ত্তব্য আছে, পুত্ররূপে, স্বামীরূপে, সুহৃদরূপে পুরুষেরও তার প্রতি আছে তেমনি কর্ত্তব্য। আমাদের পুরুষ সমাজ নির্লজ্জ স্বার্থপরতার সঙ্গেই নিজেদের পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় আদায় করে নেয়, কিন্তু অন্যের প্রাপ্য সম্বন্ধে সুবিবেচনা করে না—এর ফলও ফলে

মারাত্মক রূপেই। নারী শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-সংস্কারে পরিপূর্ণতা লাভ করে না—তথাকথিত আন্তঃপুরিক কর্ত্তব্যও তাই তার দ্বারা সুচারু রূপে সম্পন্ন হতে পারে না। সমাজ-জীবনের অর্দ্ধাঙ্গ হল নারী—সে অঙ্গ জড়তা ও কুসংস্কারের ভারে হয়ে রয়েছে পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তাই এ সমাজ মেরুদণ্ড সোজা করে উঠে দাঁড়াতে পারে না কোন দিন, নারীর অনগ্রসর দুরবস্থা তাকে টেনে নীচেয় নামায়।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্ম্মসাধনায় পুরুষ নারীর চেয়ে স্বভাবতই শ্রেষ্ঠ নয়, নারীকে এসবের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেই এ রাজ্যে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার কায়েম রয়েছে—নারীকে পথ ছেড়ে দিয়ে দেখা দরকার, সে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে কিনা। এই মতবাদকে রূপ দেবার জন্যে তিনি নারী ও পুরুষের সহ-শিক্ষা সমর্থন করেছিলেন এবং পতি-নির্ব্বাচনে যেমন, অবাঞ্ছিত বিবাহ-বন্ধন ছেদেন তেমনি পুরুষের মতোই নারীরও স্বাধীনতা তিনি অনুমোদন করেছিলেন।

অনগ্রসর সমাজে যাদের জন্ম হয়েছে এবং সেই কারণেই যারা লেখাপড়া শিখতে বা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে আসতে পারে নি, তাদের সুযোগ সুবিধা দিলে, তারা যে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর চেয়ে কম যায় না এবং নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার দিলে, তারাও যে কোন ক্ষেত্রেই পিছনে পড়ে থাকে না— এ আজ পরীক্ষিত হয়েছে, ধীরে হলেও সমাজে এই আদর্শ আজ প্রতিষ্ঠিত হতেও চলেছে। বলা অনাবশ্যক, এই দৃষ্টি-ভঙ্গীর পেছনে রবীন্দ্রনাথের দানই হল সব চেয়ে বেশী।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা দরকার। রবীন্দ্রনাথ

শিক্ষা বা সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রগতিশীল এবং সংস্কারপন্থী ছিলেন বলেই তিনি যা-কিছু-প্রাচীন, তার ধ্বংস কামনা করতেন না। শিক্ষার ব্যাপারে তিনি অগ্রগামী জগতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সমস্ত গ্রহণীয় বস্তু আহরণের পক্ষপাতী হয়েও, এদেশের যা মহৎ, যা সত্য, যা কল্যাণ-প্রদ, তাকে সমর্থন করেছিলেন। তাই তিনি প্রাচীন আদর্শে আশ্রম স্থাপন করেছিলেন এবং উপকরণহীন আত্মজ্ঞানঋদ্ধ জীবনাদর্শকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কার্য্যত সফল হননি হয়ত, কিন্তু তাঁর লক্ষ্যটা আমাদের ভুল করলে চলবে না। সমাজ ব্যাপারেও তিনি অনুন্নতের উন্নয়ন এবং নারীর অগ্রগতি সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করেও একথা স্বীকার করতেন যে অবস্থা নির্ব্বিশেষে সমস্ত মানুষই নাগরিক হবে না —তার মধ্যে অনেককেই হতে হবে কৃষক, শ্রমিক, বৃত্তিজীবী এবং সেই ভাবেই করতে হবে সমাজ-সৌধের ভারসাম্য রক্ষা—সমস্ত নারীই রাজনীতি, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মানুশীলন করবেন না, তাঁদের অনেককেই হতে হবে সাধারণ সংসারের গৃহিণী এবং সন্তান ধারণ ও পালনের দায়িত্বও পূর্ণভাবেই নিতে হবে—তা সত্ত্বেও তাঁদের প্রত্যেককেই মানুষ হিসাবে পরিপূর্ণতা লাভ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁর সংস্কার-নীতির পেছনে ছিল সত্যকার একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা—নিছক মত প্রকাশের নূতনত্বকে তিনি শ্রদ্ধার্হ মনে করতেন না কোন দিনই। তাঁর পরিকল্পিত নূতন সমাজকে গড়ে তুলতে হলে কি তার উপায়, সে সম্বন্ধেও তিনি নীরব ছিলেন না—কিন্তু সে প্রসঙ্গ আমি আগেই আলোচনা করেছি।

শিক্ষা

নিজের জীবনে রবীন্দ্রনাথ স্কুল-কলেজের বাঁধা-বরাদ্দ পাঠ্য পড়ে পরীক্ষা পাশ করেন নি, এ শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মনে অণুমাত্র শ্রদ্ধাও ছিল না। এই শিক্ষাপদ্ধতিতে সমস্ত মানুষকেই একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে মানুষ করার চেষ্টা হয়ে থাকে—ধরে নেওয়া হয় যে মানসিক গঠনে মোটামুটি ভাবে সমস্ত মানুষই এক, তাই একই পদ্ধতিতে একই আদর্শে সকলকে লাইনবন্দী করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর ছাপ দিয়ে দেওয়াই হল এই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সব মানুষই এক নয়—প্রত্যেকের মনন ধারা স্বতন্ত্র, তার আহরণের পদ্ধতিও এক নয়, কাজেই প্রচলিত ব্যবস্থায় পরীক্ষা পাশ অনেকে করলেও, শিক্ষালাভ করে খুব কম সংখ্যক লোকই। তাছাড়া যে পাঠ্যতালিকা আমাদের প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তার ভেতর মনের ঐশ্বর্য্য ও চিন্তার স্বকীয়তা বৃদ্ধির উপযোগী জিনিষও কি খুব বেশী থাকে? কতকগুলো প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় তথ্য একত্র করে শিক্ষার্থীর মাথার ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়া হয় এবং একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরখ করে দেখা হয়, সে ঠিক ঠিক আহৃত বিষয়গুলি আবৃত্তি করে যেতে পারে কিনা—এতেই এই শিক্ষা সমাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ছক-বাঁধা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন নি এবং দেশের ভাবী নর-নারীর পক্ষেও একে অসার্থক বলেই মনে করেছেন। তাঁর নিজের শিক্ষালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যেই হল এর প্রতিকারে অগ্রসর হওয়া এবং নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী আদর্শে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। সেইজন্যে তিনি সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা থেকে ডিগ্রীর লোভকে

বিতাড়িত করলেন এবং তার স্থানে নিয়ে এলেন চিন্তার আনন্দ ও প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য। নীরস নিরুজ্জল পাঠ্য বিষয়গুলির সঙ্গেই তিনি সংযুক্ত করলেন নৃত্য, গীত ও চিত্রাঙ্কণ প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে এবং পাঠ্য বিষয়ের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থী যা আহরণ করবেন, সৃষ্টির ভেতর দিয়ে তাকে প্রকাশ করাকেই তিনি সবচেয়ে বড় শিক্ষা বলে ধরে নিলেন। এই জন্যে তিনি সবচেয়ে বড় করে ধরলেন প্রকৃতির মধ্যে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করার আদর্শকে—খোলা মাঠে, উন্মুক্ত আকাশের তলায়, শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরতে নিত্য নিয়ত প্রকৃতির রাজ্যে চলছে যে বিচিত্র ভাঙাগড়া, তার ফুল-ফল কীট-পতঙ্গ জীব-জন্তু প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে যে বৈচিত্র্য ও অভিনবতা, তা থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে, একান্তভাবে বিষয়াত্মক শিক্ষা লাভ মানব-মনের স্বাভাবিক প্রবণতার বিরোধী বলেই তাঁর ধারণা, এবং ভাবী পরীক্ষার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একান্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেড়া অতিক্রম করার জন্যে পড়ে যাওয়ারও তিনি কোন সার্থকতা দেখতে পাননি। তিনি মনে করেছিলেন, বাইরের জগৎ ও অন্তর্জগতের মধ্যে একটি যোগসূত্র স্থাপন করে, নিত্য নূতন প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা মানুষের মনে চিন্তা, কল্পনা, অনুভূতি ও বিচার-বিশ্লেষণের প্রবৃত্তিকে উদ্রিক্ত করাই প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষাই হল সমস্ত মননশীলতার চালক শক্তি স্বরূপ। যার মনে দেখবার ও দর্শনীয় বিষয়কে উপভোগ করার, বিশ্লেষণ করে ব্যাখ্যা করে বোঝবার ও বোঝাবার শক্তি এসেছে, তথ্যের অভাব তার মনকে বাধা দিতে পারে না—তথ্য সে আপনি আহরণ করে নিতে পারে, এমন কি স্বল্প তথ্যের পুঁজি নিয়েও সংস্কৃতির মর্ম্ম সে অনায়াসেই গ্রহণ করতে পারে।

শিক্ষা

আসলে শিক্ষা প্রসঙ্গে পাঠ্য বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা কি ? ধরা যাক ব্যাকরণ—ভাষার ব্যবহার ও বিন্যাসের কতকগুলি নিয়ম-কানুন বেঁধে দেওয়াই ত ব্যাকরণের উদ্দেশ্য, কিন্তু যে ভাষার সাহায্যে ভাব প্রকাশ করবার জন্যে লেখনী ধারণ করবে, এই নিয়মকানুনে প্রয়োজন শুধু তারই—প্রাত্যহিক সংসারে পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের জন্যে যখন আমরা কথা বলি, তখন ব্যাকরণের নিয়ম মানা সহজও নয়, তার প্রয়োজনও নেই। অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিক্ষণীয় বিষয়ই হল এক একটি উদ্দেশ্যের পরিপূরক, কিন্তু আমাদের শিক্ষায়তনে আদি উদ্দেশ্যটিই গেছে চাপা পড়ে—তার স্থানে এসেছে শুধু আনুষঙ্গিকের কড়াকড়ি গুলো। তাই আজ নাবালক শিক্ষার্থীকে সমাস, সন্ধি ও তদ্ধিত-কৃতের জাঁতা কলে ফেলে নাকাল করা হয়, কিন্তু যে জন্যে এদের প্রয়োজন, সে দিকটির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করনো হয় না মোটেই। যদি নবীন শিক্ষার্থীকে তার স্বাধীন ইচ্ছানুসারে মনোভাব প্রকাশের জন্যে সুষ্ঠু ভাষার ব্যবহার শেখানো হত, এবং তারই পথে প্রয়োগ ও বিন্যাসগত ভুল-ত্রুটিগুলি উদ্ঘাটিত করে দেখানো হত, তাহলে ব্যকরণ তার কাছে এমন ভয়াবহ পদার্থ হয়ে উঠত না।

সমস্ত বিষয় সম্বন্ধেই মোটের ওপর এই কথা। গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান আমরা পড়ি কেন ? জীবনের কোন ক্ষেত্রে কোথায় এদের প্রয়োজন না জানা থাকায়, স্কুল-কলেজে প্রত্যক্ষ জীবন থেকে বিচ্যুত করে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে আমরা করে তুলি কতকগুলি নীরস তত্ত্বের সমষ্টি এবং সেখানেই আমাদের শিক্ষাদান প্রণালীর সত্যিকার ত্রুটি। জীবন সম্পর্কে শিক্ষণীয় প্রসঙ্গের যোগ লক্ষ্য করলে, স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি দিয়েই শিক্ষার্থী তার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তখনই তা তার

চিন্তা ও মননশীলতার রাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করে। তার সুযোগ না থাকলে, হৃদয়ঙ্গম করার আশা ছেড়ে দিয়ে তাকে শুধু মুখস্থ করার ওপর জোর দিতে হয়। এই ভাবেই এসেছে আমাদের দেশে অর্থ পুস্তক, শর্ট-কাট ইত্যাদি এবং প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার সমুদয় পর্ব্বকেই নির্ব্বিচারে করেছে পরীক্ষা পাশের সোপানে পরিণত।

রবীন্দ্রনাথ এই কৃত্রিম শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণের ব্যতিক্রম ঘটালেন তাঁর প্রতিষ্ঠানে। আগেই বলেছি, তিনি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে যে অধ্যয়ন তার সমর্থক ছিলেন না—সেই সঙ্গেই দেখিয়েছি, মনের সহজ আনন্দ ও স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে প্রাত্যহিক অনুভূতি গুলির ভেতর দিয়ে কল্পনা ও মননশীলতার প্রসার ঘটনাকেই তিনি নিয়েছিলেন সত্যকার শিক্ষা বলে, সেই জন্যে তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় কলা-বিদ্যাই নিয়েছে মূলস্থান, আর তত্ত্ববিদ্যা হয়েছে তার সহকারী। কলা-বিদ্যার সঙ্গে মানুষের যে যোগ তা হল আনন্দের যোগ—এই আনন্দই হচ্ছে সমস্ত আহরণের আদি উপকরণ, যাকে আমাদের কেতাবী শিক্ষা সম্পূর্ণ রূপে ছেঁটে বাদ দিয়েছে। সেই জন্যেই আমাদের প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা আমাদের মনের সঙ্গে সহজ আনন্দে একাকার হয়ে যেতে পারে না। পরীক্ষা পাশের পরই সুরু হয় আমাদের জীবিকা সংগ্রহের পালা এবং সবিস্ময়ে লক্ষ্য করি যে আমাদের অবলম্বিত বৃত্তির সঙ্গে আমাদের আহৃত বিদ্যার কোনই সংস্রব নেই। সে বিদ্যা অনুশীলন ও উপলব্ধির অভাবে কখন মন থেকে স্খলিত হয়ে গেছে! কিন্তু যদি আমাদের শিক্ষাকে আমাদের অন্তরের রসে রসিয়ে নিতে পারতাম, তাহলে আমাদের সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে দিয়ে অন্তঃপ্রবাহী ধারার মতো তা বয়ে চলতো। এই বনিয়াদ গঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই

রবীন্দ্রনাথ প্রণয়ন করলেন তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থা—সেই জন্যে তা থেকে তিনি সাম্প্রতিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যকে বিতাড়িত করলেন এবং খোলা মাঠে ছেলে ও মেয়ে একত্রে খেলাধূলা গান-গল্প আমোদ-প্রমোদের ভেতর দিয়ে যাতে অনায়াসে সংস্কৃতি ও সভ্যতার, শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রাণ সম্পদে ঋদ্ধ হয়ে উঠতে পারে, তার অনুযায়ী বিধি-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করলেন। এই সঙ্গেই তিনি লক্ষ্য রাখলেন, যাতে ভাব ও অনুভূতির রাজ্যে একান্ত ভাবে নির্ব্বাসিত হয়ে তারা বাস্তবতা বিমুখ হয়ে না ওঠে—সেইজন্যে শান্তিনিকেতনের ভাব-বিদ্যালয়ের সঙ্গেই তিনি স্থাপন করলেন শ্রীনিকেতনের শিল্প-বিদ্যালয়।

বিভিন্ন শ্রম-শিল্পের সাহায্যে হাতে-কলমে জীবিকার্জ্জন শিক্ষা দেওয়া ভিন্ন ভাব-তান্ত্রিক শিক্ষায় সুফলের চেয়ে কুফল হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই বিচক্ষণ কবি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে ভাবমূলক শিক্ষার বাহনরূপে স্থাপন করে জাতির সাম্নে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ একটি নূতন শিক্ষাদর্শ স্থাপন করলেন। দেশে-বিদেশে আজ শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে চলেছে রকমারি পরীক্ষা নিরীক্ষা—রবীন্দ্রনাথের দানও সে দিক থেকে সমস্ত জগতে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্বীকৃত হয়েছে।

কিন্তু যুগ-ধর্ম্মে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা হয়ে উঠেছে প্রধানত অর্থকরী এবং অর্থোপার্জ্জনের ক্ষেত্রে ডিগ্রীই হল একমাত্র যোগ্যতা নিরূপণের মাপকাঠি। কাজেই এদেশের বেশীর ভাগ গৃহস্থই তাঁদের ছেলেমেয়ে-দের ডিগ্রীহীন শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ইচ্ছুক বা সাহসী হলেন না। সেইজন্যে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস-বাঁধা পাঠ্য পড়ানো এবং তার পরিচায়ক ডিগ্রী অর্জ্জন করানোকেই সানুরাগে আঁকড়ে রইলেন—আর রবীন্দ্রনাথকে চালাতে হল তাঁর প্রতিষ্ঠান প্রধানত অবস্থাপন্ন

ঘরের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে, যাদের অনেককেই চাকুরীর দ্বারা অন্ন আহরণ করতে হবে না। সেই জন্যেই প্রথম শ্রেণীর এমন মেধাবী ও প্রতিভাবান ছাত্র তিনি পেলেন না, যাদের উপর তাঁর আদর্শ প্রয়োগ করে তিনি সত্যকার সাফল্য পেতে পারেন। তাই জনগণের রুচি ও অভিপ্রায়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে, শেষকালে তাঁকে বিভিন্ন কলাবিদ্যা অনুশীলনের সঙ্গেই স্বীকার করতে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থিত সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্য পড়ানো এবং পরীক্ষা দেওয়ানোও। কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তিনি শেষদিন পর্য্যন্ত এর অনুমোদন করেননি। তাঁর লোকান্তর প্রাপ্তির পর এখনকার কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর কোন পন্থা অবলম্বন করবেন, তা আমাদের জানা নেই। তবে যতদূর মনে হয়, কবির পরিকল্পনাকেই তাঁরা বাঁচিয়ে রাখতে যথাশক্তি চেষ্টা করবেন। অন্তত করা ত উচিত।

সাহিত্য

সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এত স্বল্প পরিসরে বুঝিয়ে বলা অসম্ভব, আর তার সার্থকতাও কিছু আছে কিনা সন্দেহ, কারণ তাঁর সাহিত্যিক মতামত অল্পবিস্তর সকলেরই জানা। বিভিন্ন সময়ে প্রবন্ধে, বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে তিনি এ নিয়ে আলোচনা করেছেন, অন্যান্য লেখকও তাঁর সাহিত্যালোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে অনেক নূতন আলোক সম্পাত করেছেন। তবু আমাদের এই আলোচনার সমগ্রতার জন্যেই সে সম্বন্ধেও দু-একটি কথার অবতারণা আবশ্যক।

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সাম্প্রতিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপকরণ মনে করতেন না, বা সাময়িক চিত্ত-বিনোদনই তার একমাত্র লক্ষ্য বলে স্বীকার করতেন না। তিনি মনে করতেন, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত্তের সৃষ্টি, মানুষের সর্ব্বোত্তম অনুভূতির প্রকাশ —তার অবলম্বন হল সৌন্দর্য্য, সত্য, আনন্দ, তা কোন বিশেষ দেশের সঙ্কীর্ণ সীমায় বা বিশেষ সময়ের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়—সর্ব্ব-দেশের সর্ব্বকালের মানুষের পক্ষে যা সত্য, সেই শাশ্বত সত্যের ওপরই সাহিত্যের স্থিতি—কোন বিশেষ দেশ ও বিশেষ জাতির ধর্ম্ম, রাজনীতি বা সমাজকে আশ্রয় করে যদিও তার জন্ম, তবু তার লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ ভাবে সমস্ত মানুষ। তাই তাকে প্রচার, প্রপাগ্যাণ্ডা বা উদ্দেশ্য সাধনের বাহন করে তোলা চলে না—করলে তার আবেদন হয় সাম্প্রতিক এবং সমসাময়িক সমাজের মনোরঞ্জন বা প্রয়োজন সাধন করেই একদিন তা অন্তর্হিত হয়ে যায় মানুষের ইতিহাস থেকে। বিশ্ব-

সাহিত্যের স্থায়ী কীর্ত্তি যে গুলি, তা চিরদিন বেঁচে আছে শুধু তাদের অবলম্বিত শাশ্বত সত্যের জোরে এবং সে সত্য সমস্ত মানুষের কাছেই সমান অর্থবান।

বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে সুপরিচিত আদর্শবাদেরই পুনরুক্তি স্বরূপ। এই মত অনুসারে মানুষের মনোধর্ম্ম হল একটি অপরিবর্ত্তনীয় জিনিষ—যুগে যুগে বাস্তব অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, জীবন যাত্রার আদর্শ বদলায় নানা উপকরণের উদ্ভাবন ও আবিষ্কৃতির ফলে, কিন্তু হৃদয়ের যে সমস্ত বৃত্তির জন্যে মানুষ মানুষ, তা সর্ব্বকালেই থাকে এক। এইজন্যে যা সুন্দর, যা মহৎ, যা বিচিত্র, যা আনন্দ-বেদনায় চির অম্লান, তার কোনদিন পরিবর্ত্তন নেই—যুগে যুগে বদলায় তার নির্ম্মোক, কিন্তু সমস্ত বহিরুপাদানের আড়ালে অবস্থিত যে প্রাণবস্তু, তা থাকে চিরঅবিকৃত। আশা-নিরাশা, মিলন-বিরহ, জন্ম-মৃত্যুকে মানুষ চিরদিন দেখেছে একই চোখে—বিশ্বের শোভা-সৌন্দর্য্য, শক্তি-সমৃদ্ধি মানুষকে চিরদিনই ভাবিয়েছে এক রকম করে। জননীর স্নেহ, প্রিয়ার প্রণয়, প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ, মানুষ গ্রহণ করেছে চিরদিনই একই রকম অনুরাগে। এই জন্যেই বাল্মীকি-ব্যাস, হোমর-এস্কিলিস, হাফেজ-কালিদাস চিরদিনের কবি, সমস্ত মানুষের কবি। বিদেশী কবি বলেছেন—

Nothing is new.
Each age hath a story as old as the Sun's,
And the flower of to-day
Is but a repetition of yesterday's bloom.

এই আদর্শবাদের সমর্থনেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য থেকে প্রত্যক্ষতার

দাবী নাকচ করার পক্ষপাতী ছিলেন। এর মানে এই নয় যে তিনি তাঁর সাহিত্যিক আদর্শকে সংস্থাপিত করেছিলেন হাওয়ার ওপর। তিনি বাস্তবকে স্বীকার করেই নিয়েছিলেন, কিন্তু বাস্তবের ওপর অত্যুগ্র কল্পনার প্রয়োগ করে, তাকে তিনি বস্তু-সীমার ঊর্দ্ধে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে বাস্তবের স্থান হল রসসৃষ্টির পশ্চাৎ ভাগে, পুরোভাগে যা ফুটে উঠবে, সে হল রচয়িতার ভাব-সত্তার রূপ। তাঁর লিরিক কবিতার ও গল্প-নাটকের অপরিসীম ভাবমুখিতা এবং বস্তু-সংস্রবের গৌণতা, যা একালে বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয় হয়েছে, তাঁর আদর্শ অনুযায়ী তাই খাঁটি জাতের সাহিত্য। অবশ্য তিনি নিজে কোনদিন একথা বলেছেন তা নয়, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর যে মূলনীতি তাঁর সমালোচনা-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে, তা ধরে বিচার করেই এই সিদ্ধান্তে আসতে হয়।

কিন্তু মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ব্যাখ্যা করে এই মতবাদকে অনেকেই সমর্থন করেন নি। তাঁরা বলেন যে মানুষের মন একটা আটঘাট বাঁধা স্থূল জিনিষ নয়—তা হল কতকগুলি বৃত্তি ও সংস্কারের সমষ্টি এবং সে সংস্কারের জন্ম বাস্তবের সঙ্গে সঙ্ঘাত থেকে। বাস্তবে নূতন নূতন উদ্ভাবন ও আবিষ্কৃতি যতই জীবন যাপনের আদর্শ ও ও পরিকল্পনায় পরিবর্ত্তন আনে, ততই (তাদের ওপর নির্ভরশীল) মনোবৃত্তির প্রকৃতি ও পদ্ধতি অলেক্ষ্য বদলাতে থাকে। সভ্যতার আদিতে প্রকৃতিকে মানুষ যে চোখে দেখেছিল, আজকের বিজ্ঞান-বুদ্ধি সমৃদ্ধ মানুষও তাকে সেই চোখেই দেখে না—জীবনরহস্যের বিভিন্ন দিককে পুরাণো মানুষ যে ভাবে বুঝেছিল, দর্শন ও মননের উন্নততম স্তরে এসে আজো মানুষ তাই বোঝে না। এমন কি, এঁরা বলেন যে

দয়া-মায়া, প্রেম-বিরহ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যে সমস্ত বৃত্তিকে আমরা শাশ্বত বলে মনে করি, সেও অপরিবর্ত্তিত সমাজব্যবস্থার ভেতর পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হয়ে থাকার ফল। যদি এই সমাজবিধান পাল্টে ফেলা যায় এবং নূতন করে শৈশব থেকে মানুষকে নূতন সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তাহলে দেখা যাবে, এ জিনিষ-গুলোও আরোপিত। এই জন্যেই এঁরা তথাকথিত আদর্শবাদকে স্বীকার করেন না—বা সাহিত্যবিচারের মাপকাঠি সেই অনুসারে বেঁধে দেওয়ারও সমর্থন করেন না।

এঁরা বলেন যে সাহিত্য হবে বাস্তব আবেষ্টনী থেকে আহৃত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলিরই সুষ্টু বিন্যাস—আর তার উদ্দেশ্য হবে মানুষকে তার জীবন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে সজাগ করে তোলা, তাকে চিন্তা ও মননের ভেতর দিয়ে নূতনতর মহত্তর সৃষ্টির প্রেরণা জাগানো। সে সৃষ্টি এঁদের মতে বাস্তব সংসারের চতুঃসীমাতেই আবদ্ধ—এর বাইরে অপার্থিব কোন কল্প-লোককে এঁরা স্বীকার করেন না। তাই সৌন্দর্য্য প্রশাস্তি বা বিশ্বকল্যাণের নামে বস্তুকে এড়িয়ে লোকত্তর রসসৃষ্টির প্রয়াসকে এঁরা অসার্থক মনে করেন। এঁরা বলেন, পরীশ্রমজীবী বুর্জ্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে—দেশপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, আধ্যাত্মিকতা, সৌন্দর্য্যবাদ প্রভৃতির সাহায্যেই তার অধিকার কায়েম রাখার চেষ্টা হয়েছে। আদর্শবাদী সাহিত্য সেই কায়েমী স্বার্থেরই একটা বৃহৎ আনুষঙ্গিক বলে এঁদের বিশ্বাস। এঁরা তাই মনে করেন যে যে-বিবর্ত্তনের ধারায় সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা আদি ও মধ্যযুগের ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পৌছেছে, তা মানুষের সমস্ত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মতোই সাহিত্যকেও নূতন করে গড়ে তোলার

প্রেরণা দিয়েছে। সে হল গণসাহিত্য রচনার প্রেরণা। অর্থাৎ এ-কালের সাহিত্য নিছক রসসৃষ্টির কাজে ব্যপৃত থাকবে না, তাকে হতে হবে অন্যান্য উৎপাদনমূলক শ্রমের সামিল এবং সেই জন্যেই তাকে করতে হবে বাস্তবের আনুগত্য।

বলা অনাবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ এই সত্যকে স্বীকার করেন নি। তিনি বলেছেন তত্ত্ব, তথ্য, মত, মন্তব্য, যাই কেন না আসুক সাহিত্যে—তা হল গৌণ, সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হল রসসৃষ্টি এবং সে রসের স্থিতি বাস্তবের ওপর হলেও তার গতি বাস্তবাতীতের দিকে। কাজেই সাহিত্য প্রসঙ্গে কোন সে-কাল এ-কালের প্রশ্ন উঠতে পারে না—ওর আদর্শ চিরদিনকার, গণসাহিত্য বা শ্রেণী সাহিত্য বা আর যে কোন রকম শ্রেণী বিভাগের দ্বারাই সাহিত্যকে চিহ্নিত করা হক, সাহিত্য এক অখণ্ড বস্তু—তার এলাকাও দিগন্ত বিস্তৃত। কাজেই শ্রেণীহীন সমাজের পরিকল্পনা সামনে নিয়ে যা লেখা হয়, শুধু তাই সাহিত্য নয়, শ্রেণী-স্বার্থের সমর্থন করেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্য হতে পারে। এতকাল তাই হয়েছে। বরং তথাকথিত গণসাহিত্যই এখনো তার প্রাণশক্তির পরীক্ষায় ষোল-আনা জয়যুক্ত হয়নি। তিনি বলেন পলিমৃত্তিকা কোন স্থায়ী কীর্ত্তির ভিত বহন করতে পারে না, অর্থাৎ কেবল মাত্র শ্রমজীবীই যুগ-সংস্কৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারে না।

এটা অবশ্য তর্কের বিষয় এবং এ তর্কের দু'কথায় মীমাংসা হওয়াও কঠিন। তবে কবির একথা সকলেই স্বীকার করবেন যে সাহিত্যে যুগে যুগে আদর্শে, অবলম্বনে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে যতই কেন না পরিবর্ত্তন আসুক, একটা জায়গা আছেই, যেখানে সে চিরন্তন এবং সে জায়গাটা বস্তু নয়, ভাব।

শিল্প

সাহিত্য, নৃত্য-গীত ও চিত্রকলার, এক কথায় সমগ্র ভাবে শিল্পের আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত সুবিদিত। প্রবন্ধ সাহিত্যে তিনি এদের প্রত্যেকটির তত্ত্ব নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন—সেই আলোচনায় তাঁর স্বকীয় দর্শনের স্বরূপও যথাসম্ভব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর সেই বহুবিস্তৃত রচনাবলী থেকে নিষ্কর্ষ আহরণ করেই এখানে কয়েকটির কথার অবতারণা করা যাচ্ছে।

সাহিত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোন বিশেষ মতবাদের বাহন বলে স্বীকার করতেন না—কোন সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণ হিসাবে তাকে ব্যবহারেরও তিনি সমর্থক ছিলেন না একথা আগেই বলেছি। তাঁর মতে যদিও বাস্তবই হল সাহিত্যের আদি-ভূমি, তবু প্রাত্যহিক বাস্তবকে অতিক্রম করে চিরন্তন সত্য ও সৌন্দর্য্যের স্তরে উন্নীত হওয়াই সাহিতের ধর্ম্ম—অর্থাৎ বাস্তবের দুঃখ-বেদনা, আঘাত-অবমাননা, ব্যর্থতা-বঞ্চনা, অসঙ্গতি-অনৈক্য সাহিত্যের আসরে আসবে, কিন্তু রসের ঐশ্বর্য্যে, কল্পনার সমৃদ্ধিতে, অলঙ্করণের চাতুর্য্যে নিজেদের বস্তু-সীমাকে ছাপিয়ে উঠতে না পারলে, সাহিত্যের অঙ্গণে তারা কখনই জলাচরণীয় হয়ে উঠবে না। যা সুন্দর, যা শান্ত, যা আনন্দঘন, তাই হল তাঁর মতে সাহিত্যের আদর্শ, তার উপকরণ যাই হক না কেন।

আগের অধ্যায়েই দেখিয়েছি যে তাঁর মতে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেকাল একাল বলে কিছু নেই—যুগে যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির

ব্যবহারিক চেহারায় পরিবর্ত্তন হয়, জীবন যাপনের প্রকৃতি ও পদ্ধতিতে ওলট পালট হয়, কিন্তু মানুষের মনোবৃত্তির মৌলিক সূত্রগুলি অবিকৃতই থাকে। তাই প্রাচীন যুগে, মধ্যযুগে, আধুনিক যুগে মানুষের মননক্রিয়ার প্রকৃতি একই রয়ে গেছে। সৌন্দর্য্যবোধ, শুভবুদ্ধি, আসঙ্গলিপ্সা, আর যা-কিছু বোধ জৈব বৃত্তির গোড়ার কথা, তার কিছুই বদল হয়নি—এরা শাশ্বত, সেই জন্যেই সত্য ও সুন্দর। একখানি চিঠিতে তিনি কৌতুক করে বলেছেন, 'আমরা দেখিয়েছি দুকুল দুলিয়ে বকুল বনে যাওয়ার প্রলোভন, অনুনয় করেছি অলক্তরঞ্জিত মঞ্জীরশিঞ্জিত পদে অনুপ্রাস-মুখর ললিতছন্দের তালে তালে চলতে। কালধর্ম্মে ফ্যাসন বদলেছে, তোমরা আজ আমন্ত্রণ করো পার্কে, পরে আসতে বলো স্লিপার, নয়ত হিলতোলা জুতো, এবং গতির মধ্যে তোমরা আনতে চাও ক্ষিপ্রতা। কিন্তু পরিবর্ত্তনটা কোথায়? উদ্দেশ্য সেই একই—তা সেকাল একাল সব কালের বড় আদালতেই পেয়েছে আপনার স্বীকারনামা।'

এই দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসরণেই সাহিত্যকে তিনি সাম্প্রতিক রাজনীতি ও সমাজকল্যাণের বাহন মাত্র মনে করেন নি। দক্ষিণ-বাম কোন বিশেষ মার্গের দাসত্বে সাহিত্যকে নিয়োজিত করাকেও তিনি সমীচীন মনে করেন নি। তাঁর মতে সাহিত্য হচ্ছে মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অনুভূতিগুলির প্রকাশ, সে অনুভূতি যে পর্ব্বেরই হক না কেন, এবং সে প্রকাশকে তিনি অলঙ্করণের আভিজাত্যে অভিষিক্ত করে নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'মত জিনিষটা হচ্ছে সৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবদেহের অন্তর্গত কঙ্কালের মতো। ওটা ভেতরে থেকেই সাহিত্যকে জোগাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি—বাইরে

প্রকাশ পাবে তার বিচিত্র দেহসৌষ্ঠব, তার লাবণ্য। কিন্তু অঙ্গ-সজ্জাকে আজ মনে করা হচ্ছে অনাবশ্যক, মনে করা হচ্ছে অসার্থক, নিছক কাজের কথা বলাই হয়েছে হাল আমলের লক্ষ্য, আর সে কথা হচ্ছে দরিদ্রের উন্নয়নের কথা। দারিদ্র্য আছে, তার উন্নয়নের দাবীও থাকবে সাহিত্যে—কিন্তু তা ছাড়া কি আর কিছুই থাকবে না? সৃষ্টিচক্রে শুধু পঙ্কটাই গণ্য হবে সত্যি বলে, আর পঙ্কজটা হয়ে যাবে মিথ্যা? শিল্পীকে এই জন্যেই হতে হবে সহজ—কোন বিশেষ মতবাদের কাছে যদি তিনি দাসখৎ লিখে দিয়ে বসেন, তাহলে পক্ষপাতের কুয়াসায় তাঁর সত্য দৃষ্টি হবে বাধা প্রাপ্ত, তাঁর সাহিত্যও হবে সত্যভ্রষ্ট। এই জন্যেই সাহিত্যের যা সত্য, তা কোন বিশেষ আমলের রাজনৈতিক প্রপাগ্যাণ্ডার লেজুড় ধরে চলতে পারবে না।'

বলা বাহুল্য এখানে তিনি লক্ষ্য করেছেন আধুনিক বামপন্থী আন্দোলনকে এবং এ আন্দোলনকে তিনি সাহিত্যের দিক থেকে অবাঞ্ছনীয় বলেই মনে করেছেন। তিনি আরো স্পষ্ট করেই বলেছেন একখানি চিঠিতে, 'হঠাৎ একদিন আবিষ্কৃত হল যে এতদিন যা সুন্দর বলে, মহৎ বলে, সার্ব্বজনিক বলে ধরা হয়ে এসেছে, তা গর্হিত—কারণ তার পেছনে রয়েছে বুর্জ্জোয়া সংস্কৃতির প্রশ্রয়। যারা কায়িক শ্রম করে এবং সেই শ্রমের লভ্যাংশ যারা ভোগ করে, তাদের মধ্যে চিরদিন চলে এসেছে যে বিরোধ, তাকে রাজনীতিক পোষাক পরিয়ে আজ সাহিত্যের আসরে ডেকে আনা হচ্ছে—বলা হচ্ছে, এই বিরোধের নিষ্পত্তিই হল আধুনিক সাহিত্যের চরম লক্ষ্য। এর বাইরে আর যা-কিছু রইলো, যেহেতু তা কায়িক শ্রমে যারা জীবিকাহরণ করে তাদের প্রয়োজনের বা আয়ত্তের বাইরে, সেই জন্যেই তার উচ্ছেদ প্রয়োজন।...বেশ কথা,

তা হলে সংস্কৃতি থাকবার দরকার নেই, শিল্প-সাহিত্যই বা থাকবে কোন গরজে?'

কবির শেষ কয় বৎসরের প্রবন্ধে ও চিঠিপত্রে এই কথাটা বারবারই প্রকাশ পেয়েছে। বলা অনাবশ্যক যে সাহিত্যের সংজ্ঞা ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর যা অভিমত, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে তা চমৎকার ভাবেই রূপায়িত হয়েছে এবং তার মহিমাও আমরা পূর্ণ ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করি। কিন্তু মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী ও মননধারার মৌলিক অপরিবর্ত্তনীয়তাকে (যার ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মতবাদ) ইদানীন্তন সমালোচকরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন, সমাজব্যবস্থার পরিবর্ত্তন আসে জীবন যাপনের মান এবং উপকরণ বদলালে এবং সেই পরিবর্ত্তন অজ্ঞাতসারেই আমাদের সংস্কার ও ধারণার রাজ্যে ওলটপালট ঘটায়—তবু যে আমরা ভূতপূর্ব্ব সংস্কার ও মতবাদের জের টেনে চলি, সে শুধু সমাজ-সংস্থানের আদি কাঠামোটা আজো বদলানো যায়নি বলেই। যদি এই প্রাকব্যবস্থিত সমাজ ও তার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানকে আমূল ঢেলে সাজা যায়, তাহলে তার আশ্রয়চ্যুত হয়ে সমগ্র সমাজ-চেতনাই বদলে যাবে। সোভিয়েট রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দেখানো হয়। পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে, ধর্ম্ম নিয়ে, আর্ট নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করেছেন এবং তাতে সাফল্যও লাভ করেছেন। আমাদের সাহিত্য থেকেও যদি শ্রেণীস্বার্থকে বা তার পরিপোষক আদর্শবাদকে কোনদিন বিতাড়িত করা যায়, তাহলে তাতে ভয়ের কিছুই নেই হয়ত। কিন্তু যে সমাজব্যবস্থার মাতৃতন্ত্র থেকে জন্মাবে সেই নূতন সাহিত্যবোধ, তার আবহাওয়া কোথায়? সমাজে চলেছে এখনো মধ্যযুগ—ধর্ম্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সর্ব্বত্রই চলছে তারি দাপট। তাকে বদলাতে হলে

চাই রাশিয়ারই মতো বিপ্লব। কিন্তু সে বিপ্লব দানা বাধবে কৌলিক ও ভৌমিক একাধিকার ভেঙে গিয়ে, তার স্থানে ব্যাপক শ্রমশিল্পের প্রসার হলে। মাঝখানকার ধাপগুলিকে টপকে শেষ ধাপে পা নেবার চেষ্টা করছি আমরা, তাই আমাদের বামপন্থী আন্দোলন আজো জীবন থেকে উৎসারিত হয়নি। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ একেবারে অমূলক নয়।

সঙ্গীত ও নৃত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতামত আমরা খুব সংক্ষেপে আলোচনা করবো। গানে সুরের আসন যে উঁচুতে রবীন্দ্রনাথ তা স্বীকার করতেন, কিন্তু কথাকে তাই বলে সুরের বাহন মনে করতেন না তিনি। সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করেও গানের কথা আত্মস্বতন্ত্র শিল্প হিসাবে উপভোগ্য নয়, এমন গান রবীন্দ্রনাথ নিজে কোনদিন লেখেননি —তাঁর সঙ্গীত গাইলে গান, পড়লে কবিতা। গান ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রাণধর্ম্মী, সুর তাঁর মতে সেই প্রাণবস্তুর পরিপোষক। তাই নিছক সুরের আলাপকে তিনি নির্ব্বিশেষ কণ্ঠক্রিয়া বলে মনে করতেন। অর্থাৎ গানে তিনি ক্ল্যাসিকপন্থী ছিলেন না, ছিলেন রোমান্সপন্থী। নিজে তিনি ক্ল্যাসিক্যল সুরের গান বড় একটা লেখেননি, পক্ষান্তরে কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল প্রভৃতি খাস বাংলা সুরকেই দিয়েছেন প্রাধান্য। তথাকথিত হিন্দুস্থানী গান সম্বন্ধে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট এবং সে মতামত নিয়ে তর্কও হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাঁর স্বরচিত গান নিয়ে যাঁরা বিচার করবেন, তাঁরা সহজেই সে তর্কের সমাধানে পৌছুবেন।

গানের মতো নৃত্যেও তিনি প্রাণধর্ম্মেরই সমর্থক ছিলেন। নানা ভাব ও বৃত্তির সজ্ঘাতে মানুষের হৃদয়রাজ্যে নিত্যনিয়ত চলছে যে আরোহ-অবরোহের খেলা, তাকে দেহভঙ্গীর ভেতর দিয়ে রূপায়িত

করাই হল তাঁর মতে নৃত্যের আদর্শ। দেহভঙ্গীকে তিনি নৃত্যের ভাষা বলে মনে করতেন এবং দেহবিন্যাসে ছন্দসঙ্গতি, মুদ্রা, মাত্রা ইত্যাদির অন্তর্মুখিতাই হল তাঁর মতে অভিজাত নৃত্যের কুললক্ষণ। শান্তিনিকেতন 'স্কুলে'র যে নৃত্য তিনি প্রবর্ত্তন করেছেন, তার মূল আদর্শ এই। এই আদর্শ অনুসারে বিচার করলে অধিকাংশ পাশ্চাত্য নৃত্যই নিতান্ত স্থূল—তাতে দেহের ব্যবহারিক বিন্যাসই প্রধান, রসের অন্তর্মুখী আবেদন প্রায় নেই বললেই চলে।

কিন্তু নৃত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন একান্তভাবে প্রাচ্য আদর্শের পরিপোষক, চিত্রাঙ্কণের ক্ষেত্রে তেমনি ছিলেন প্রতীচ্য-রীতির একান্ত অনুরাগী। তাঁর মতামত অবশ্য অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রমুখ প্রাচ্য স্কুলের শিল্পীদের অবলম্বিত অঙ্কণ রীতির অনুকূলে ছিল—কিন্তু নিজে তিনি যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন (সংখ্যায় তা প্রায় দেড় হাজার), তাতে একেবারে ইউরোপীয় অতি-বাস্তবিক (Sur-realistic) অঙ্কণেরই গোত্রসাদৃশ্য দেখি। পিকাসোর কতক ছবির সঙ্গে তাঁর ছবিগুলিকে সহজেই মিশিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য পিকাসোর অঙ্কণরীতির পেছনে ছিল তাঁর নিজস্ব একটি Philosophy—আর রবীন্দ্রনাথ প্রধানত চিত্রশিল্পী ছিলেন না বলে এজন্যে তাঁর ছিল একটা মৃদু কৈফিয়ৎ, একথা স্বীকার করতেই হবে।

চিত্রাঙ্কণকে তিনি বিধিবদ্ধ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে আয়ত্ত করেননি—সুতরাং অঙ্কণের যে গ্রামার, তা ছিল তাঁর অজ্ঞাত। ভেতরকার সৃজনী মনের তাগিদেই তিনি তুলি চালনা করেছেন, তা নিজের খেয়ালেই সৃষ্টি করে গেছে নানা 'রূপ'—যা কখনো হয়েছে বাস্তবের প্রতিরূপ, কখনো বা তাঁর মনের। কেতাবী মতে ছবির পরিপ্রেক্ষণী,

আঙ্গিক সংস্থান বা বর্ণগত কারিকুরি নিয়ে বিচার করলে তাই তাঁর সব ছবি ধোপে না টিঁকতে পারে—কিন্তু ছবির প্রাণবস্তু যা, তা তাঁর প্রায় সমস্ত রচনাতেই পাওয়া যাবে।

রবীন্দ্রনাথের এই কথাই পিকাসোপন্থীরাও বলেছেন, তবে একটু ঘুরিয়ে। তাঁরা বলেন, সাহিত্যে বা শিল্পে আমরা ভাব প্রকাশ করি যে ভাষায়, সে ভাষা অভ্যস্ত বলেই তার অসম্পূর্ণতা আমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু আসলে মনের প্রতিরূপ অঙ্কণে এরা বড়ই অপটু বাহন। মনের অবচেতন পর্দ্দায় কোন জিনিষই পরস্পরসম্বদ্ধ হয়ে নেই—সবই আছে একে অন্যের সঙ্গে তাল-গোল পাকিয়ে। তাই বাইরের একটা কোন ইঙ্গিতে বা উদ্দীপনায় মনের ভেতর যখন কোন ভাব রূপ পরিগ্রহ করে, তখন তা সমগ্র ও সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ চেহারা নিয়ে গড়ে ওঠে না—অনেক কিছু খণ্ড-চিত্রের সঙ্গে জড়িয়েই তা হয়ে ওঠে একটা অখণ্ড অসংলগ্নতা। তাই আর্টে মনের যে রূপটি প্রকাশ পায়, তা অসত্য—বাইরে থেকে তৈরী করা একটা convention-এর আনুগত্য করতে করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি বলেই তার কৃত্রিমতা আমরা ধরতে পারি না। এঁরা বলেন, খাঁটি জাতের আর্ট সৃষ্টি করতে হলে এই কৃত্রিমতার হাত এড়াতে হবে—অবচেতনাকে দিতে হবে শিল্পের মধ্যে রূপ। এজরা পাউণ্ড, কাম্মিংস প্রমুখ কবিরা এবং পিকাসো, মাতিস প্রমুখ চিত্রশিল্পীরা তাঁদের রচনায় এই মতাবাদকে অনুসরণ করেছেন—তাঁদের সৃষ্টিতে যে দুর্ব্বোধ্যতা দেখা যায়, তা এই জন্যেই। সাহিত্যে এই অবচেতনার অভ্যুদয়কে রবীন্দ্রনাথ আদৌ সমর্থন করেননি, বাংলা দেশে এই দিক থেকে যে আন্দোলন হয়েছে, তিনি তাকে নিন্দাই করেছেন, কিন্তু চিত্রাঙ্কণে তিনি নিজেই এই পথাবলম্বী।

নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা

শান্তিনিকেতন ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠিত চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের অভিনয় দেখে সম্প্রতি বিশেষ আনন্দ লাভ করেছি। নৃত্যনাট্য জিনিষটি বাংলা রঙ্গমঞ্চে এখনো নূতন—কাজেই এর স্বাদে আমরা সবিশেষ অভ্যস্ত হইনি। সেই জন্যই বোধকরি এই রঙ্গানুষ্ঠানের মনোহারিতা বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

আলোচ্য নৃত্যনাট্যে নৃত্য ও গীত উভয়ের সমন্বয়ে নাটকের কথা-বস্তুকে পরিণতির মুখে নিয়ে যাওয়া হয়েছে—কিন্তু গীত এতে আনুষঙ্গিক, নৃত্যই এর প্রধান অবলম্বন। গীত এবং বাদ্য এর পরিবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত, তা দর্শকের অনুভূতিকে পরিপুষ্ট হতে সহায়তা করেছে মাত্র, কিন্তু নাটকীয় সংস্থান ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া রূপায়িত হয়েছে নৃত্য-ভঙ্গিমার ভেতর দিয়েই। কাজেই এর অভিনয় ভাষার দিক থেকে প্রায় মূক—দেহ-বিন্যাসের আরোহ-অবরোহের ও তার সূক্ষ্ম তারতম্যের ভেতর দিয়েই তা বিস্ময়কর রূপে মুখর। গীত যেহেতু এতে নৃত্যের সহকারী, সেইজন্যে এর অন্তর্গত অধিকাংশ গানই লেখা অনেকটা কথোপকথনের ঢঙে। অবশ্য বিশুদ্ধ জাতের সঙ্গীতও যে নেই এতে তা নয়, বরং নৃত্য-ক্রিয়ার সঙ্গে সর্ব্বত্রই গীতি-ধর্ম্মের যে রকম আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা গেল, তাতে গীতের সাঙ্গীতিক ন্যূনতা কোথাও আছে, তা সহসা যেন বোঝাই যায় না। কবি যে ইচ্ছা করেই এর গানগুলিকে এই রকম বাচনিক ঢঙে লিখেছেন তাতে সন্দেহ নেই,

কারণ আমরা আগেই বলেছি, এই নাটকে গানকে তিনি নৃত্য-ক্রিয়ার অনুপূরক হিসাবেই গ্রহণ করেছেন। তা নাটকে পেছন থেকে গল্প জোগানোর ভার নিয়েছে, এবং সেই সঙ্গে সুরের সহযোগিতায় নৃত্যকেও করেছে জীবন্ত। অর্থাৎ আলোচ্য নৃত্যনাট্য রচনায় কবিকে একাধারে লিখতে হয়েছে গীত, আবার তাকে খাপ খাওয়াতে হয়েছে নৃত্যের বিষয়-বস্তুর সঙ্গে।

গীতি-নাট্যের সঙ্গে নৃত্য-নাট্যের প্রভেদ সুস্পষ্ট। গীতি-নাট্যের চরিত্রগুলি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়, তাকে গীতির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে। কাজেই সেখানে অভিনয়ের বাচনিক আবেদন প্রত্যক্ষ—বরং সঙ্গীতের সহায়তা পাওয়ায় তার দ্যোতনা অধিকতর স্পষ্ট। কিন্তু কেবল মাত্র দেহভঙ্গীর ভেতর দিয়ে সমুদয় অন্তর্দ্বন্দ্বকে ভাষা দেওয়া এবং সেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন অসংখ্য ব্যঞ্জনাকে একটি অর্থপূর্ণ সমাহিত পরিণতিতে নিয়ে যাওয়া শুধু কঠিন নয়, প্রায় অসম্ভবই বলা যেতে পারে—বিশেষত দর্শকের বোধবৃত্তি যখন আখ্যানাংশের সঙ্গতিপূর্ণতার অপেক্ষা রাখে। এই দুরূহ কার্য্যে অভিনেতৃবৃন্দের আশ্চর্য্য কৃতিত্ব লক্ষ্য করলাম।

চণ্ডালিকার কাহিনীর আমরা পুনরুল্লেখ করবো না—কারণ কবি ইতিপূর্ব্বে এই নামে যে গল্প-নাটিকা রচনা করেছিলেন, এর বিষয়বস্তু তা থেকেই আহৃত এবং সেই সমস্ত পাত্র-পাত্রীই এতে পুনরাবির্ভূত হয়েছে। কিন্তু আগে তারা যেরূপে দেখা দিয়েছিল, এখন তা থেকে রূপভেদ ঘটেছে এবং এই রূপভেদে তাদের জন্মান্তরভেদও ঘটেছে বলতে পারি। ভাষা ও ক্রিয়া-কলাপের সহজ আবেদন নিয়ে যে অভিনয়, তা প্রত্যক্ষ সংসারের প্রতিরূপ বলেই তার গতি হয়ত অধিকতর সজীব ও

সত্যাভিমুখী হয়, কিন্তু সেই সহজ সত্যকে আড়াল করে, ভঙ্গী ও মুদ্রা মাত্র মূলধন নিয়ে, সমস্ত বিষয়টিকে জীবন্ত করে তোলা তার চেয়ে উচ্চতর অঙ্গের শিল্প। এতে ছন্দায়িত দেহ-বিন্যাসের ভেতর দিয়েই দেহাতীত ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টি আবশ্যক হয়, এখানে পেলব মাংসলতা বা ভঙ্গীর সহজ চাতুর্য্য দিয়ে বাজীমাৎ করার উপায় নেই তাই এর উপলব্ধি আজো বিদগ্ধ সমাজের এলাকায় সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। প্রাকৃতজন দেখে তারিফ করে, কিন্তু মর্ম্ম গ্রহণ করতে পারে না। চণ্ডালিকা সম্বন্ধে অবশ্য আমরা এতটা আশঙ্কা রাখিনি, তবে তাহলেও যে খুব আশ্চর্য্যন্বিত হতাম তা বলতে পারি না।

আলোচ্য নৃত্যাভিনয়ে মণিপুরী নৃত্য ও দক্ষিণী নৃত্য, তুটি স্বতন্ত্র ধারাকে একত্র মেলানো হয়েছে, সেই সঙ্গে কিছু পরিমাণ ক্যাণ্ডি নৃত্যেরও মিশেল দেওয়া হয়েছে। এই মিশ্রণ এমন সহজ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যাতে তুই ধারার বিশিষ্টতা তুইয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে গিয়ে তৃতীয় একটি রসাদর্শই গড়ে উঠেছে, যাকে শান্তিনিকেতনের নিজস্ব আদর্শ বলা যেতে পারে। দক্ষিণী নৃত্য একান্তভাবে মুদ্রাপ্রধান, কাজেই অভিনয়ের আঙ্গিক আবেদনে তা সবিশেষ সহায়তা করে—অবশ্য তাই বলে পাশ্চাত্য ট্যাঙ্গো বা ক্যাবারে নৃত্যের মতো দক্ষিণী নৃত্য ব্যঞ্জনা-বিমুখ নয়, বরং অন্তর্বস্তুর রূপায়নে তার আঙ্গিকের আনুপূর্ব্বিকতাই যেন কতকটা আতিশয্য স্বরূপ—পক্ষান্তরে মণিপুরী নৃত্য ভঙ্গীপ্রধান, কাজেই তা লালিত্যময়। টেকনিকে এই কঠোর-কোমলের যুগপৎ মিশ্রণ হওয়ায় চণ্ডালিকা নাট্যের বিয়োগ-মিলনাত্মক সুর, তার চরম দ্বন্দ্ব ও পরম সমাধান সুন্দর রূপে মূর্ত্ত হয়েছে। 'আনন্দে'র পতনের যে সুতীব্র ট্র্যাজেডী, যাতুর প্রভাবে তাঁর আত্মসমাহিত তপস্যালোকের যে

বিম্ব, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এমনি দার্ঢ্যময় একটি টেকনিকের, আবার হৃদয়াবেগের আতিশয্যে পূজনীয়ের পতনানয়নের মধ্যে যে অনুতাপ ও আর্তির সুর, তার জন্যে প্রয়োজন ছিল এমনি একটা পেলব অভিব্যঞ্জনার। এ দুইয়ের যুগপৎ মিশ্রণ চণ্ডালিকার বিষয়বস্তুকে মেঘ-রৌদ্রের বিচিত্রতা দান করেছে—কবির পরিকল্পনা আশা করি এই রকমই ছিল।

এবার অভিনেতাদের কথা। 'আনন্দে'র ভূমিকায় কেরু নায়ার যে সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের বিশেষ ভালো লাগলো—তাঁর হাত-পা ও চোখের ক্ষুদ্রতম পরিবর্ত্তনটুকুও আশ্চর্য্যজনক রূপে ভাবমুখর। নিরাসক্ত নির্ব্বাণপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষুর তপোমূর্ত্তিকে তিনি সম্যকভাবেই রূপে দিয়েছেন। শুধু শেষাংশে আমরা আর একটু মসৃণতা আশা করেছিলাম, তবে শেষাংশে তাঁর আবির্ভাবটা প্রত্যক্ষে নয়, ওটা 'প্রকৃতি'র অন্তর্দৃষ্টিতে—সেখানে হয়ত তপস্যাহানির ঝঞ্ঝামূর্ত্তিকে সে ঐ ভাবেই দেখে থাকবে। 'প্রকৃতি'র অভিনয় আগাগোড়া অব্যাহত ছন্দে বয়ে গেছে, তাতে খুব বেশী আরোহ-অবরোহের বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু কারুণ্যের স্নিগ্ধতা আছে। এত বড় ভূমিকায় আনুপূর্ব্বিক সুর রেখে চলা শুধু কৃতিত্ব নয়, প্রতিভা সাপেক্ষ—তবে তাঁর মুখে অল্প দু-একটা গান না বসালেই হত, কারণ গান ত পরিবেশ থেকেই জোগান দেওয়া হচ্ছে। এই ভূমিকায় নেমেছিলেন কবি-দৌহিত্র নন্দিতা। মায়ের ভূমিকায় মৃণালিনী স্বামীনাথনও যথেষ্ট রসজ্ঞতা ও ভাব-গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন। যাদু বিদ্যাপরায়ণা চণ্ডালপত্নীর দুর্দ্ধর্ষ ভয়ঙ্করতা একদিকে, অন্যদিকে স্নেহশীলা জননীর দুর্ব্বল হৃদয়াবেগ, এই দুই পরস্পর-বিরোধী ভাবকে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে রূপায়িত করে তিনি চমৎকার নৃত্যাভিনয়

করেছেন। এ ছাড়া দইওয়ালার নৃত্য বা পল্লীনারীদের নৃত্য বা গাথক সঙ্ঘের গীতও মোটের ওপর প্রশংসনীয়ই হয়েছে।

সর্ব্বসমেত চণ্ডালিকা নৃত্য-নাটকের অভিনয় যে বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে, একথা অসংশয়েই বলা যেতে পারে। এজন্যে প্রথমে ধন্যবাদার্হ কবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি এই নৃত্য-নাট্যের প্রবর্ত্তক, তারপর ধন্যবাদার্হ শান্তিনিকেতনের উদ্যোক্তৃবর্গ, যাঁরা আমাদের এই নাট্য-রস সম্ভোগের সুযোগ দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা গান

আমাদের ছেলেবেলায় গাইয়ে সমাজে বাংলা গান সম্বন্ধে মস্ত একটা অনুকম্পার ভাব দেখা যেত। অতি ছোটখাটো গোছের ওস্তাদও দেখেছি একটা তম্বুরা ঘাড়ে করে বসতেন এবং যে হিন্দীর এক বিন্দুও জানতেন না, তাতেই বেঁকিয়ে-চুরিয়ে গলার কসরৎ দেখাতেন। যদি কোন অতি-সাহসী বাংলা গান গাইবার ফরমায়েস নিয়ে হাজির হতেন, তাহলেই তাঁরা যেতেন চটে লাল হয়ে। হার্মোনিয়াম বাজানো আর বাংলা গান গাওয়া, তাঁরা ওস্তাদী আভিজাত্যের বিরুদ্ধ বলে মনে করতেন। স্পষ্ট করেই বলতেন, বাংলা গানে কথায় বাড়াবাড়ি—সুরের কারিকুরি ও গলার কাজ দেখানোর ওতে অবকাশ কোথায়? সুরকে ছাপিয়ে ওঠে কথা—প্রাকৃত জনের পক্ষে তা বোঝা সহজ, কিন্তু ও ত গান নয়, গানের ভ্যাংচানি!

সাদৃশ্য টেনে তাঁরা দেখাতেন যে ছবির ক্ষেত্রে যেমন অঙ্কণটাই হল মুখ্য, বিষয়-বস্তু সেই অঙ্কণের উপকরণ, সুতরাং গৌণ ছাড়া কিছুই নয়, গানের ক্ষেত্রেও তেমনি সুরই আসল বস্তু, বাণী তার বাহক মাত্র। ক্ল্যাসিক্যাল গানে এই জন্যেই কথার স্থান অনেক নীচেয়, যেমন-তেমন করে গোটা কতক লাইন দাঁড় করিয়ে, সুরের চলা-ফেরার পথটা তৈরী করে দিলেই হয়ে গেল। কথা গাঁথার যে বিশেষ পদ্ধতিকে কবিতা বলে, গানের রাজ্যে তা অবাঞ্ছিত—কারণ গান হল একটা আত্মস্বতন্ত্র শিল্প, তাকে কাব্যের ভেজাল দিয়ে ঘোলা করে তোলা শুধু অন্যায়ই নয়, অসঙ্গত। এরপর বাংলা গানের কথা তুলে তাঁরা বলতেন যে বাংলা

গান প্রথমে কাব্য, তারপর গান—সুতরাং গান হিসাবে তার প্রচলন আর যাই করুক, সাঙ্গীতিক বিশুদ্ধির দাবী করতে পারে না, তাই কুলীন গাইয়ে সমাজে ওর জলাচরণীয়তা স্বীকৃত নয়।

বলা বাহুল্য ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের চর্চ্চা এমন ভাবে করিনি, যাতে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চিত রায় দিতে পারি। তবে এটুকু বুঝেছি যে ক্ল্যাসিক্যাল স্কুল গানের ভাষাগত আবেদনকে স্বীকার করেন না, করেন সুরগত আবেদনকে। অর্থাৎ তাঁদের মতে সুরের আরোহ-অবরোহ, গমক-গিটকারী ইত্যাদি থেকে শ্রোতার মনে যে শব্দ-সঙ্গতির আনন্দ জাগে, গানের দিক থেকে সে-ই হল চরম দান। এই মূক শব্দ-ক্রীড়ার পেছনে কোন অর্থের যোগ আছে কিনা এবং সেই অর্থ অন্তর-রাজ্যে নানা ভাব-স্মৃতিকে আশ্রয় করে মুখর হয়ে ওঠে কিনা, সেটা গানের দিক থেকে মোটেই বিচার্য্য নয়। গান সুর-লীলার ভেতর দিয়ে সৃষ্টি করবে নানা নিরুপাধিক অনুভূতিকে, তাকে জীবন্ত ও অর্থবান করে তারি সাহায্যে গানকে বরণীয় করে তোলার কাজ তার নয়। যেখানেই এ কাজ করা হয়, সেখানেই এই স্কুলের মতে গান তার জাত খুইয়ে খেলো হয়ে পড়ে এবং বিশুদ্ধ সমাজের কাছে তার আর পাংক্তেয়ত্ব থাকে না।

কেতাবী মত হিসাবে এ কথার কদর যাই হক, এই ক্ল্যাসিকাল গোঁড়ামির সঙ্গে অন্তরের যোগ নেই অনেকেরই। আমাদের সমস্ত আবেগ, সমস্ত রসানুভূতিই অন্তরের রাজ্যে তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু নাম ও সংজ্ঞার নির্দ্দেশ না পেলে তারা দানা বাঁধতে পারে না, পরস্পরের সংস্রব কাটিয়ে তারা এক-একটা অখণ্ড বোধেও রূপান্তরিত হতে পারে না। অর্থাৎ চেতনার যা-কিছু সক্রিয়

বৃত্তি, তারি মূলে আছে বস্তুর সঙ্ঘাত, ভাষা এই বস্তুর নির্দ্দেশ দেয় বলেই ভাষাকে বাদ দিয়ে চলবার উপায় নেই। ক্ল্যাসিক্যাল গান যখন ভাষাকে চাপা দিয়ে কেবল মাত্র সুরের ওপর দাঁড়ায়, তখনই তা চলে যায় আমাদের বোধবৃত্তির বাইরে—তার সঙ্গে আমাদের অন্তরের যোগ ছিন্ন হয়ে যায়, মস্তিষ্ক দিয়ে আমরা করি তার কারিকুরির বিচার, মন দিয়ে তাতে মৌজ হয়ে যাইনে। পাখীর গানে, জলের শব্দে, অরণ্যের মর্ম্মর-ধ্বনিতে, যন্ত্র-সঙ্গীতের বিচিত্র কলা-কৌশলে আমরা যে আনন্দ পাই, তাই যদি সত্যিকার সাঙ্গীতিক আনন্দ হয়, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে যে সে আনন্দ মূক, তার কোন আবেদন নেই। নিজের নিজের মনোধর্ম্ম ও বাস্তব অবস্থার প্রভাবে তাতে যে আবেদন আমরা সৃষ্টি করে নিই, সে হল আরোপিত, একান্তই বাইরের জিনিষ।

এই জন্যে আমার মতে বিশুদ্ধ ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত হল ঠিক ততটা আর্ট নয়, যতটা বিজ্ঞান—তার বাঁধা ফরমিউলা আছে, সেই দাগে দাগে পা মিলিয়ে চললেই এবং নির্ভুল করে, নিখুঁত করে সেই চলার ব্যাপারটা নিষ্পন্ন করতে পারলেই তাতে উৎকর্ষ লাভ করা যায়। যাঁদের জানা, তাঁরা এই চলাচলির কেরামতিতে মুগ্ধ হন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশায় মানুষের মনে প্রতিনিয়ত চলছে যে ভাঙাগড়ার খেলা, তারি ভেতর দিয়ে পথ করে সমস্ত সুখ-দুঃখের ঊর্দ্ধে মানুষকে নিয়ে যেতে পারে যে প্রাণবন্তা ভাষা, তা এতে নেই বলেই এর অবুঝ ধ্বনিগুলো অন্তরের আনাচে কানাচে অযথা মাথা ঠোকাঠুকি করে মরে। এতে রস পেতে হলে এই জন্যেই তৈরি বিশেষ শ্রেণীর সমজদার দরকার, যার বাইরে এ জিনিষের দাম খুব বেশী নয়।

সৌভাগ্যের বিষয়, বাংলা দেশে এই বিজ্ঞান-বিশুদ্ধ গানের চর্চ্চা

মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সমাদর পেলেও, দেশের জন-মনে আসন পেয়েছে অন্য রকমের গান—সে হল রোমাণ্টিক গান, ওস্তাদী স্কুলের অনুকারীরা যাকে বাংলা বুলি বলে উপেক্ষায় মুখ ফিরিয়ে নেন। এই গানে সুরের কারিকুরি ও গলার কেরামতিকে অবশ্য ছেঁটে বাদ দেওয়া হয়নি, কিন্তু তাকে করা হয়েছে বাণীর বাহন—সুন্দর সুগ্রথিত কথার ওপর সুষ্ঠু সুর বসিয়ে, প্রতিনিয়ত ব্যবহারে ভাষার চেহারায় যে অভ্যাস-মলিন বর্ণ-হীনতা জমা হয়েছে তা দূর করা, ও তাকেই নিবিড় করে নূতন করে বিচিত্র করে মনের সাম্নে পরিবেষণ করে দেওয়া হল তার কাজ—একেই বাঙালী মনে করেছে সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে। এই জন্যেই বাংলা গান চিরদিন প্রাণধর্ম্মী, তাতে কথার আসন সবার ওপরে। ক্ল্যাসিকাল আইন-কানুনের নাকের ওপরেই বাংলা গানের যে সমস্ত নিজস্ব ঢং এদেশে চিরদিন সম্মানিত, তারা সবাই গেছে ভাষা-শিল্পের কুসুমিত পথ দিয়ে, রাগ-সঙ্গীতের কণ্টকাকীর্ণ শব্দ-ক্রীড়া তাদের আকৃষ্ট করতে পারে নি। কীর্ত্তন, ভাটিয়াল, বাউল, রামপ্রসাদী, সারী, জারী, মুর্শিদা, খাস বাংলা গান বলতে যা বোঝায়, তার সবই হল প্রাণধর্ম্মে ঋদ্ধ—সুর তাদের আছে, কিন্তু সে সুরে মাধুর্য্যই পেয়েছে একমাত্র স্বীকৃতি, কারণ তা হল ভাবানুভূতির পরিপূরক। তার বাইরে হৃদয়-সংস্রবহীন নিরর্থক কণ্ঠ-কুস্তিকে কলা হিসাবে বাংলা খুব বেশী সম্মান করেনি। রোমাণ্টিক বাঙালীর গানও রোমাণ্টিক, ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীতের গাণিতিক ছকে তাকে বাঁধা সম্ভব হয়নি।

কিন্তু তথাকথিত ওস্তাদী গানের পাণ্ডারা বাংলা গানের এই বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করতে চাননি, তার কারণ খাস বাংলা গানকে বরণীয় করে প্রচার করবার যোগ্য নেতা আগে ছিলেন না। তাই বাজার-চলতি

কীর্ত্তনীয়া, ফকির, দরবেশ, মাঝি-মাল্লা ও চাষী-মজুরদের ভেতরে সসঙ্কোচে আত্মগোপন করেই তাকে দিন কাটাতে হয়েছে। দেশের নাড়ীর সঙ্গে এদের সুগভীর যোগ সকলেই টের পেয়েছেন, কিন্তু যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করার সুবিধা হয়নি, একই সঙ্গে বড় গায়ক ও গীত-রচয়িতা না থাকায়। রবীন্দ্রনাথ এ অভাব পূরণ করার পর থেকে বাংলা গানের অস্পৃশ্যতা ঘুচেছে। ভদ্রসমাজে কলাচর্চ্চার প্রাত্যহিক ভোজে তার আসন কায়েম হয়েছে, শুধু কায়েমই নয়, অনেক দিক থেকে তথাকথিত ক্ল্যাসিকাল গানের ওপরেই তার স্থান হয়েছে। (এইখানে বলে রাখা আবশ্যক যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্যে যদুভট্ট ও মধ্যবয়সে গোঁসাইজীর সংস্রবে থেকে ক্ল্যাসিকাল গানের অনুশীলন কম করেন নি।) রবীন্দ্রনাথের মতো বড় রচয়িতা ও সুরস্রষ্টা কীর্ত্তন, বাউল প্রভৃতিকে পাংক্তেয় করে তুললেন বলেই দেশের শিক্ষিত সমাজ কালোয়াতি কসরতের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলো। সেখান থেকেই নূতন করে সুরু হল বাংলায় গীত-আন্দোলন। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ, নজরুল ইসলাম প্রমুখের দানও এদিক থেকে কম নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই হলেন বাংলায় এ যুগে সঙ্গীতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তি-দাতা।

আজকে বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সুরু হয়েছে গানের অনুশীলন। এতদিন এটা হতে পারে নি, তার কারণ দেশের প্রত্যেকটি অলিগলি আটক করে পাগড়ী ও তাম্বুরাধারী পালোয়ানরা পাহারা দিচ্ছিলেন সঙ্গীত-লক্ষ্মীর অঙ্গন। আজ তাঁদের আসন হয়েছে যোগ্যস্থানে এবং যে-কোন লোক সামান্য চর্চ্চা ও প্রচুর প্রাণের আনন্দ নিয়েই গানের আসরে এগিয়ে এসেছেন। এর জন্যে ধন্যবাদার্হ রবীন্দ্রনাথ।

সেদিন বিশ্বভারতী সম্মেলনের বৈঠকে কবি যে বক্তৃতা দিয়েছেন,

তাতে দেশের এই সাঙ্গীতিক নব-জাগরণের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই যাঁরা তাঁর গানকে মূল সুর থেকে বিচ্ছিন্ন করে আপন খুসী মাফিক সুর দিয়ে গেয়ে থাকেন, তাঁদের তিনি নিন্দাও করেছেন প্রচুর। জিনিষটা ভালো বুঝতে পারিনি। ক্ল্যাসিকাল গানের প্রচার নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতর, তার রীতি-পদ্ধতিও ছক-বাঁধা, কাজেই ওতে সুর-বিশুদ্ধি রক্ষা করা সম্ভবপর। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীত দেশের জন-মনে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ধরণ-ধারণেও কোন বাঁধাবাঁধির বালাই নেই, কাজেই কণ্ঠ থেকে কণ্ঠান্তরিত হতে হতে তার গোত্র পরিবর্ত্তন হওয়া অসম্ভব নয়, বরং তা হওয়াই প্রত্যাশিত, এবং তা না হলে সঙ্গীতের রাজ্যে সর্ব্বসাধারণের অবাধ প্রবেশই বা কি করে সম্ভব হবে? প্রাচীন বাংলা গানে এই স্বাধীনতা ছিল, তাই তা মরে নি। আধুনিক গানও মরবে না, যদি তাতে সেই স্বাধীনতার অধিকার মঞ্জুর করা হয়, আর বাংলা গানের (মানে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের) মেজাজই সে অধিকার দাবী করে। সুতরাং যে ক্ল্যাসিকাল কড়াকড়ি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ দেশকে দিলেন মুক্তির স্বাদ, সেই মুক্তি কেড়ে নিয়ে আবার তিনিই কড়াকড়ি প্রবর্ত্তন করতে চাইছেন কেন, এ আমার বুদ্ধিতে আসে নি। এতে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রসারই যে শুধু ব্যাহত হবে তা নয়, বাংলা দেশের একালীন সাঙ্গীতিক অগ্রগতিও বাধা পাবে। অবশ্য যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন আছেই, কিন্তু কবি যাঁদের উদ্দেশে প্রতিকূল উক্তি করেছেন, যোগ্যতার পরীক্ষায় তাঁরা কি অনেকেই অনেক দিন আগে উত্তীর্ণ হন নি?

শনিবারের চিঠি ও রবীন্দ্রনাথ

ইদানীং রবীন্দ্রনাথকেও শনিবারের চিঠির লেখক তালিকাভুক্ত দেখতে হয়, দেশের পক্ষে এটা বাস্তবিকই দুশ্চিন্তার কথা। যে শনিবারের চিঠি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে বাংলার নবীন-প্রবীণ সমস্ত সাহিত্যিককেই করেছে অস্বীকার, তাঁদের রচনাকে উপলক্ষ্য করে, আসলে করেছে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর কুৎসা আরোপ এবং অর্দ্ধসত্য ও অসত্য অভিযোগের সঙ্গে অশিষ্ট রসিকতা ও অশ্লীল চিত্রের সমাবেশ করে, দেশের রুচি, চিন্তা, বুদ্ধি ও মননশীলতাকে করেছে পদে পদে বিড়ম্বিত, সেই শনিবারের চিঠির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত দেখে, তাতে তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে দেখে, আমরা শুধু অবাকই হই নি, দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ভীত হয়েছি।

রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে শনিবারের চিঠির বিশেষ সংখ্যায় কবিকে যে ভাবে চিত্রে-গল্পে-গানে অপমান করা হয়েছিল, তাঁর পারিবারিক সম্ভ্রম ও ব্যক্তিগত মর্য্যাদাকে যে ভাবে পদদলিত করা হয়েছিল, তার জন্যে রবীন্দ্রানুরাগীরা শনিবারের চিঠিকে কোন দিনই ক্ষমা করবেন না। সেই 'এসো দাড়ি নাড়ি কলিমুদ্দী মিঞা' এবং 'তুলাদান' ছবি, সেই 'পতন রব্যুদয়' গান, কোন মহিলার রবীন্দ্র-বন্দনামূলক কবিতাকে বিকৃত করে সেই বিশ্রী ইঙ্গিত—কিছুই আমরা ভুলিনি। যেমন ভুলিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মনিষ্ঠার ওপর অকারণ কটাক্ষ করা, শান্তিনিকেতনের শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে বা সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে অশ্লীল ও অশিষ্ট টিপনী কাটা। সেই শনিবারের চিঠিতে রবীন্দ্রনাথকে লেখক-

রূপে যোগ দিতে দেখে আমরা হতাশ হয়েছি, এই ভেবে যে রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষও শেষটা শনিবারের চিঠির ব্যবসাবুদ্ধি প্রণোদিত মতের আবর্ত্তে ধরা দিলেন এবং নিজের অজান্তেই তার দীর্ঘ দিনের অন্যায়পণা ও অসদাচরণকে সমর্থন করলেন।

অবশ্য এ কথা বলতে চাই না যে সাধারণ মানুষের মতো রবীন্দ্রনাথেরও প্রতিহিংসা পরবশ হওয়া উচিত ছিল। তা ছিল না এবং তা তাঁকে শোভাও পেতো না। কিন্তু সমস্ত দেশের হয়ে এ কথা আমরা অবশ্যই বলবো যে যে-পত্রিকা দেশের শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ—সর্ব্বক্ষেত্রে অবস্থিত ছোট-বড় প্রত্যেক কর্ম্মীর করেছে কল্পনাতীত লাঞ্ছনা, এমন কোন অপভাষা নেই যা নির্ব্বিচারে তাঁদের সম্বন্ধে প্রয়োগ না করেছে, স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ পর্য্যন্ত মানে নি—স্ত্রীলোকের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ, তাঁদের বিবাহিত জীবনের ওপর পর্য্যন্ত বাঁকা মন্তব্য করেছে, এমন কদর্য্য কাগজে দেশের প্রবীণতম সাহিত্যনেতা হয়ে রবীন্দ্রনাথের যোগদান না করাই উচিত ছিল। তাঁর সঙ্গে দেশের সম্বন্ধটা কেবল মাত্র সাহিত্যিক নয়, সাংস্কৃতিক, তাই এ দাবী আমরা অবশ্যই করতে পারি। তাঁর ওপর ব্যক্তিগত ভাবে চিঠি যে কুৎসা, কলঙ্ক ও অপভাষা আরোপ করেছে, তা তিনি উপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু সমস্ত দেশের ওপর যা করেছে, তা তিনি অনুমোদন করেন না নিশ্চয়ই। একদা চিঠির এই অসদাচারের প্রতিবাদে সুনীতি বাবুকে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে সমস্ত দেশের হয়েই অভিভাব রূপে অগ্রণী হতে দেখেছি তাঁকে। সেই রবীন্দ্রনাথ আজ সহসা তাঁর মত বদলালেন কি জন্যে, সেটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

কথা উঠবে, চিঠি তার মত ও পথ বদলাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে

বলেই কবি তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। মত ও পথ চিঠি কতটা বদলেছে, তা তার আধুনিকতম যে-কোন সংখ্যা খুলে দেখলেই টের পাওয়া যাবে। সেই বাপ তোলাতুলি ও খিস্তি, সেই অর্দ্ধসত্য উদ্ধৃতি, সেই শ্রদ্ধেয়কে হীন প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা সমানে চলছে। নূতনত্বের মধ্যে দেখছি, ইদানীং প্রতি সংখ্যায় একটি করে সচিত্র সাহিত্যিক জীবনী কিংবা 'অধুনালুপ্ত রচনাবলীর পাঠ ও পঞ্জী প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মুখ চেয়েই চিঠির সমস্ত অপরাধ কবি ভুলে যাবেন? গাঁঠকাটাও একদিন সাধু হতে পারে, পতিতারও একদিন দেশসেবিকা হওয়া আশ্চর্য্য নয় এবং তখন তাদের ঘরে তুলে নিলেও দোষের কিছু হয় না, কিন্তু যথারীতি গাঁঠকাটাগিরি ও পতিতাবৃত্তি পরিচালনা করেই যেদিন তারা সমাজে বরণীয় হয়, সেদিন সমাজের পক্ষে ঘোর তুর্দ্দিন। বড়ই দুঃখের কথা, রবীন্দ্রনাথের মতো পুরুষের জীবদ্দশায়, তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এত বড় দুর্ব্বিপাক দেশে দেখা দিতে পারলো!

শনিবারের চিঠি প্রচার করেছে যে আধুনিক কালে বাংলা দেশ জাতীয় সংস্কৃতির আশ্রয়চ্যুত হয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথই তার জন্যে ষোল-আনা দায়ী। শনিবারের চিঠি বলেছে, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমের ভাঁওতা দিয়ে দেশকে তার নিজস্ব ঐতিহ্য-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন, ব্রাহ্ম পাদ্রী রূপে তিনি দেশের জীবনাদর্শকে চূর্ণ এবং যুবসম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করেছেন—দীনবন্ধু, বঙ্কিম, মধুসূদনের সৃজনী-প্রতিভা যে বাংলা সংস্কৃতির স্রষ্টা, সেই খাঁটি সোনা মাটি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে—আজকের শিল্পে, সাহিত্যে, রাজনীতিতে যে ব্যভিচার, ভণ্ডামি ও কাপট্য প্রবেশ করেছে, তার মূল প্রবর্ত্তনা নাকি এসেছে রবীন্দ্রনাথের এই বিজাতীয় সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকেই। সুতরাং নৈতিক কর্ত্তব্য

হিসাবেই চিঠি রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রানুগামীদের সম্ভ্রমহানি করেছে এবং সেই সঙ্গেই নিজেদের গড়ে তোলা একটি অভিপ্রেত গোষ্ঠীর অনুকূলে প্রচার কার্য্য চালিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কি মনে করেন, চিঠির এই মত ও পথ ইতিমধ্যেই বদলেছে? শনিবারের চিঠির আধুনিকতম সংখ্যায় পর্য্যন্ত বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ব্রাহ্মদের দানকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে রাখা হয়েছে। স্বয়ং ব্রাহ্ম এবং একদা তত্ত্বাবোধিনী সভার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা রবীন্দ্রনাথ কি বলবেন, এ অভিযোগ সত্য এবং সত্যের অনুকূলেই চিঠির মত বদলেছে?

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা প্রকাশ করে শনিবারের চিঠির সম্পাদক কবির কাছ থেকে প্রশংসা লাভ করেছেন। যদিও টুটেনখামনের সমাধি বা মহেঞ্জোদড়োর ধ্বংসস্তূপ থেকে এই সব জিনিষ আবিষ্কার করতে হয় নি, তবু এ উদ্যোগ ভালো। কিন্তু কবি নিশ্চয় লক্ষ্য করে দেখেন নি যে এই উদ্যোগের পেছুনেও একটি গোঁড়া হিঁদুয়ানির প্রপাগ্যাণ্ডা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। রামমোহনকে আড়াল করে মৃত্যুঞ্জয় ও ভবানীচরণকে এবং দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, কেশবচন্দ্রকে পিছু হঠিয়ে দিয়ে কেবলমাত্র বিদ্যাসাগর, কালী সিংহ এবং টেকচাঁদ ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যটা কি? বলা বাহুল্য এঁরা (মানে মৃত্যুঞ্জয়, ভবানী চরণ, বিদ্যাসাগর, কালী সিংহ, টেকচাঁদ) সকলেই শ্রদ্ধেয়—বিদ্যাসাগর এবং কালী সিংহ ত বাংলা গদ্যের তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখকই, কিন্তু তাই বলে বাংলা গদ্যের ইতিহাস থেকে রামমোহন, অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিকেও বাদ দিতে পারা যায় কি? বলাই বাহুল্য, এঁদের রচনাবলীও আজ দুষ্প্রাপ্য। চিঠিওয়ালারা কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে কোন কথাই উচ্চবাচ্য করেন না। যাঁরা এদেশে

সামাজিক মুক্তি ও সাংস্কৃতিক অগ্রগামিতার প্রথম নেতা, শিক্ষা, সাহিত্য, রাজনীতি, আচার-অনুষ্ঠান সর্ব্ববিষয়ে যাঁরা বাংলা দেশকে মধ্যযুগীয় জড়তার অন্ধকার থেকে যুক্তিসিদ্ধ আধুনিকতার পথে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের দানকে এই ভাবে ধামা-চাপা দিয়ে রাখার পেছনে এঁদের মস্ত একটা স্বার্থ নিহিত আছে।

এ হল চিঠির একটা deplomatic drive এবং যে কারণে বঙ্কিমানুগামী ও রবীন্দ্র-বিরোধী আন্দোলনের জন্ম, এর জন্মও তারি প্রাথমিক সোপান রূপে। এইভাবে ধাপে ধাপে চিঠি খোদ রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত সরিয়ে দিয়ে বাংলায় নব্য হিন্দু-অভ্যুত্থানের ইতিহাস খাড়া করবে, এঁদের পরিকল্পিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই সম্ভবত সেটা পূর্ণভাবে টের পাওয়া যাবে। শনিবারের চিঠির আওতায় এসে অজ্ঞাতসারেই যে রবীন্দ্রনাথ দেশে একটি অনিষ্টকর প্রগতি-বিরোধী আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, এ তাঁকে আমরা সবিনয়ে জানাতে চাই।

চেতন-অবচেতন

কিছু কাল পূর্ব্বে বিষর্প রোগে আক্রান্ত হয়ে কয়েক ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ রূপে সংজ্ঞালুপ্ত অবস্থায় ছিলেন। চেতন আর অচেতন এই দুই চরম অবস্থার মধ্যবর্ত্তী অবচেতন অবস্থাটা এই অবসরে তিনি যে ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, আলোচ্য কাব্যে তারি কথা বলেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও সম্পূর্ণ অভিনব বলেই এই কাব্য তাই ভাষার ভাণ্ডারে স্মরণীয় হবার যোগ্য।

মনস্তত্ত্ব বলে, অবচেতন মনই হল আমাদের সমস্ত স্মৃতির ভাণ্ডার, সমস্ত কামনা-কল্পনার মূলাধার—সে হিসাবে শিল্প ও সাহিত্যের আদি-জন্মভূমিই হল অবচেতনা। কিন্তু মনের স্বধর্ম্মেই এই রাজ্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা অনভিজ্ঞ, তার কারণ আমাদের সমস্ত চেতনাই বস্তুমুখী—বস্তু সম্পর্কহীন নিরবলম্ব বোধ বা চেতনার কোন অস্তিত্বই আমরা টের পাই না। কিন্তু এই রকম অভাবনীয় অবসর মননশীল ব্যক্তির জীবনে অবশ্যই আসা সম্ভব, যখন তাঁর মনে হয়—

> দেখিলাম অবসন্ন চেতনার গোধূলি বেলায়
> দেহ মোর ভেসে যায় নিয়ে অনুভূতি পুঞ্জ।
> দূর হতে দূরে যেতে যেতে
> ম্লান হয়ে আসে তার রূপ।
> এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ব বৈচিত্র্যের পরে।
> ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
> অন্তহীন তমিস্রায়।

যখন তিনি অনুভব করেন—

অতীতের সঞ্চয় পুঞ্জিত দেহখানা ছিল যাহা
আসন্নের বক্ষ হতে ভবিষ্যের দিকে মাথা তুলি,
বিন্ধ্যগিরি ব্যবধান সম, আজ দেখিলাম
প্রভাতের অবসন্ন মেঘ তাহা শ্রান্ত হয়ে পড়ে
দিগন্ত বিচ্যুত—বন্ধমুক্ত আপনাকে লভিলাম
সুদূর অন্তরাকাশে ছায়াপথ পার হয়ে গিয়ে
অলোক আলোক-তীর্থে সূক্ষ্মতম বিলয়ের তটে !

এই যে জন্ম ও মৃত্যু, চেতন ও অচেতন, জৈব অস্তিত্বের দুই প্রান্তিক বিন্দু, একে সংযুক্ত করে রয়েছে একটি মধ্য-অবস্থা—এটা সহসা অনুভব করা যায় না, এই রকম কোন দুর্লভ অবসর না হলে। আত্মবীক্ষণশীল যোগী হয়ত একেই অনুধাবন করেন যোগে, যার কথা বলেছেন দার্শনিক গ্যেটে, Suddenly flashes out a region long hidden in the depths of our self, when matter and material senses cease to function.

এই অবচেতন লোকের স্বরূপ কবির ভাষায় বিচিত্রতা লাভ করেছে। আলো নেই, শব্দ নেই, বায়ুপ্রবাহশূন্য অনড় অন্ধকারের ভেতর একটি প্রচ্ছন্ন দ্যুতির শিহরণ, একটি সম্মিলিত গুঞ্জনধ্বনির অস্ফুট প্রতিধ্বনি—সম্মুখ-পিছন, উপর-নীচ পরিব্যাপ্ত করে সীমাহীন একটি নিরবয়ব পরিমণ্ডলের বিস্তার—

এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিলসূত্র যবে
ছিঁড়িল অদৃশ্যাঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতি দূর নিঃসঙ্গের দেশে

নিরাসক্ত নির্ম্মমের পানে। অকস্মাৎ মগ্ন একা
ডাক দিল একাকীরে।
মনে হল মুহূর্ত্তেই থেমে গেল বেচা কেনা
শান্ত হল আশা-প্রত্যাশার কোলাহল।

সংজ্ঞাপ্রাপ্তির অল্পক্ষণ পরেই কবি একখানি ছবি এঁকেছিলেন—সেই ছবিতে যে অজ্ঞাত লোকের একটি অস্ফুট ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কয়েকটি কবিতাতেও তারি আভাস সুস্পষ্ট। মনের এই গ্রন্থিমুক্ত ক্ষণিক বিরতির অবকাশে ভাষা যখন নিরস্ত, স্মৃতি যখন বিচ্ছিন্ন, তখনকার অনুভূতি কেবল বর্ণময়, আলো-অন্ধকারের সূক্ষ্ম তারতম্যে তার পরিমাপ—ঐ ছবির মতো প্রান্তিকের বহু কবিতাতেও তারি ছায়া দেখলাম। ক্রমে সংজ্ঞা যত স্ফুট হয়ে এসেছে, অস্তিত্ব ও তার বৈচিত্র্য ততই প্রকট হতে হতে পূর্ণাঙ্গ চেতনার বিকাশ কি ভাবে সমগ্রতা পেয়েছে, তারও ক্রমিক আভাস প্রান্তিকে দেখা যায়—

চরম ঐশ্বর্য্য নিয়ে
অস্তগগনের, শূন্য পূর্ণ করি এল চিত্রভানু,
দিল মোরে করস্পর্শ, প্রসারিল দীপ্ত শিল্পকলা
অন্তরের দেহলীতে, গভীর অদৃশ্যলোক হতে
ইশারা ফুটিয়া পড়ে তুলির রেখায়। আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত রূপ নিয়ে দেখা দেয়!

পূর্ণ চৈতন্যের স্ফুরণ হবার পর কবি দেখলেন, পুরাতন পরিচিত পৃথিবীর সত্যকার রূপ—

দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্ব্বাঙ্গে তার

বিকৃতির কদর্য্য বিদ্রূপ।

তখন তিনি কাতরকণ্ঠে বললেন—

শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী।

মানবীয় চৈতন্যের সঙ্গে অহংজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত—সেই চৈতন্য যখন দেহের তটসীমায় নিরুদ্ধ, তখন সর্ব্বপ্রথম যে অনুভূতি, তা আত্মবিস্মৃতির, অহঙ্কারমুক্তির। সেই সর্ব্বস্মৃতিহীন নির্ম্মুক্ত একাকিত্বের ওপর সংজ্ঞাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কি করে আবার জৈব চেতনার সঞ্চার হল, কি করে সহসা বিচ্ছিন্ন অতীতের সঙ্গে আপনা আপনিই আবার সংযোগ সাধিত হল, নিজত্ববোধ ফিরে এলো, কবি তা নিপুণ ভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর ভাষা এই ক্রম-পরিণতিটুকু ধরিয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এখানেই প্রান্তিকের শেষ। সংজ্ঞালুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বস্তু-জগতের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ দিয়ে শুরু হয়ে, সংজ্ঞাশক্তির পুনঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত এই বহুবিচিত্র দুর্লভ ও দুর্জ্ঞেয় ব্যাপারটি সমগ্রভাবে প্রান্তিকে আশ্চর্য্যরূপে পরিস্ফুট হয়েছে—একটির সঙ্গে আর একটি কবিতার ঐক্য তাই এই বইয়ে এতই সহজলভ্য যে এদের সবগুলিকে নিয়ে অখণ্ড একটি কাব্যই জন্মলাভ করেছে বলতে পারি। এদের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী বলিষ্ঠ, ঋজু, অথচ অনলঙ্কৃত এবং অকৃত্রিম—লিরিকধর্ম্মী রবীন্দ্রকাব্যে এরা নবজাতক। কিন্তু এই কাব্যের সত্যিকার বিচার ঠিক এখনি হওয়া সম্ভব কি না বলতে পারি না, কারণ এই কাব্যের মর্ম্মদেশে যে অনুভূতির বাসা, তা মনসমীক্ষণের অন্তর্গত—কাব্যসৃষ্টির একেবারে গোড়ার সূত্র ধরেই তাই এই কাব্যের বিচারে প্রবৃত্ত হতে হবে। মনে হয়,

সে হিসাবে 'প্রান্তিক' কবির ইদানীন্তন কাব্য-গ্রন্থগুলির মধ্যে সব চেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বশেষ কবিতাটি এই বইয়ের অন্তর্গত না হলেই ভালো হত। কাব্যটির সমাপ্তিতে যে একটি গাম্ভীর্য্যের স্বর আছে, তা ওতে ব্যাহত হয়েছে মনে হল।

গদ্য-কবিতা

'শেষ সপ্তক' রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতম কবিতার বই এবং তাঁর গদ্য-কবিতা পর্য্যায়ের এটি দ্বিতীয় বই। প্রথম বইয়ে কবি যে আদর্শ নিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করেছিলেন, বর্ত্তমান বইয়ে তা পূর্ণতা লাভ করেছে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু প্রচলিত ছন্দোবন্ধ ও মিলকে পরিহার করে গদ্যে কবিতা লেখার হেতু কি তা নিয়ে অনেক পাঠকের মনেই হয়ত প্রশ্ন আছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে চিঠিপত্রে এবং প্রবন্ধে সাধারণকে মোটামুটি ভাবে এ বিষয়ে কতকটা অবহিত করেছেন, নিজে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং সাহিত্য পরিষদে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি করেও দেখিয়েছেন যে তথাকথিত ছন্দ এবং মিল না থাকলেও, এই এই গদ্য কবিতাগুলির মধ্যেও এক রকমের স্বর ও ছন্দ আছে, যা একটু তৈরী কান থাকলেই ধরা যায়। এ কথা সত্য হলেও অবশ্য ছন্দচাতুর্য্য কাব্যের পক্ষে অনাবশ্যক হয়ে পড়ে না, আবার গদ্যে কবিতা লেখার বিরুদ্ধেও কোন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না তা থেকে।

প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা বলেছেন, ছন্দোবন্ধ পদ হল পদ্য, আর রসাত্মক বাক্য হল কাব্য—সুতরাং প্রকৃত কাব্য যা, তা গদ্যেও রচিত হতে পারে, একথা শাস্ত্রমতেই স্বীকৃত। আর এ স্বীকৃতির কারণও আছে—প্রকৃত কাব্যের বিচার তার প্রাণবস্তু নিয়ে, ছন্দ হল কাব্যের অবয়ব, কাজেই খাঁটি জাতের কাব্যের ক্ষেত্রে ওটা না থাকলেও ক্ষতি হয় না কিছু। এই আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সংস্কৃত সাহিত্য-শাস্ত্রীরা 'কাদম্বরী' জাতীয় গদ্য আখ্যায়িকাকে কাব্য নামেই অভিহিত

করেছেন—গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত চম্পূকাব্যও সংস্কৃতে লেখা হয়েছে প্রচুর। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে হিব্রু থেকে বাইবেলী 'পুরানো পুঁথি'র এবং গ্রীক থেকে 'নূতন পুঁথি'র যে ইংরেজী তর্জ্জমা হয়, তাতেও গদ্যকেই কবিতার মর্য্যাদা দিয়ে গ্রহণ করা হয়েছে।

গদ্যে কাব্য রচনার এ রকম নজীর সব সাহিত্যেই কিছু কিছু হয়ত পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতম কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত ছন্দই কাব্যের প্রধান বাহন, এমন কি একমাত্র বাহন হিসাবে সারা জগতে চলে আসছে। হয়ত প্রাচীন যুগে যখন ছাপা আবিষ্কৃত হয়নি, কাব্যকে যখন বাঁচিয়ে রাখা হত কণ্ঠস্থ করে, তখন ছন্দোবদ্ধ কাব্য রচনা ছাড়া উপায়ই ছিল না, কিন্তু বহু শত বৎসরের চর্চ্চায় ক্রমশ কাব্য রচনার এই বিশেষ ধরণটি এমন একটি শিল্প-পদবী লাভ করেছে এবং তার প্রভাবও এমনি সার্ব্বভৌম ভাবে গৃহীত ও স্বীকৃত হয়েছে যে আজ আর তাকে অতিক্রম করে যাওয়া সহজ নয়। একমাত্র বৈচিত্র্য বা ব্যতিক্রমের জন্যেই সাধারণত একে বর্জ্জন করার চেষ্টা হয়েছে, সে সেকালেও, একালেও। তবে আশার কথা যে একালে এই ব্যতিক্রমের সমর্থনে একটা সঙ্গত যুক্তিই খুঁজে পাওয়া গেছে। কিন্তু তার কথা পরে বলছি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কবি ওয়াল্‌ট হুইটম্যান তাঁর Leaves of Grass কাব্যে ছন্দ পরিহার করে সোজা গদ্যের আশ্রয় নিয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য কবির হাতে গদ্য-কবিতা পৃথিবীতে বোধ হয় সেই প্রথম লেখা হয়। সংসার সম্বন্ধে, মানুষ সম্বন্ধে, অন্যায়, অসত্য ও অনৈক্য সম্বন্ধে তাঁর মনে জেগেছিল যে বেদনা ও সহানুভূতি, তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন অনলঙ্কৃত বলিষ্ঠ ভাষায়।

কাজেই তাঁর পক্ষে এই আঙ্গিক যে বিশেষ উপযোগী হয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই। রুশ কথা-সাহিত্যিক টুর্গেনিভের Poems in Prose বইও এই প্রসঙ্গে অনুল্লেখযোগ্য নয়। প্রাত্যহিক জীবনের পটভূমি থেকে কুড়িয়ে আনা ছোট ছোট ছবি ও তাদের আনুষঙ্গিক ছোট ছোট সুখ-দুঃখ ও প্রীতি-প্রেমের ইঙ্গিতকে কেন্দ্র করে লেখা এই কবিতাগুলির বিশেষত্ব কে না স্বীকার করবেন? এরা যেন এক-একটি ছোট গল্পের চালচিত্র। এরকম কবিতার পক্ষেও গদ্যই হয়ত প্রশস্ত টেকনিক।

কিন্তু হুইটম্যান বা টুর্গেনিভের পদ্ধতি রসাত্মক লিরিকের পক্ষে কতটা উপযোগী তা প্রমাণ সাপেক্ষ। অনেক দিন আগে রবীন্দ্রনাথ 'লিপিকা' নামে যে বই লিখেছিলেন, তার অন্তর্গত 'মেঘদূত' 'পায়ে চলার পথ' প্রভৃতি রচনাগুলি প্রাণধর্মে কবিতা হওয়া সত্ত্বেও কবি তাদের প্রবন্ধ রূপেই উপস্থিত করেছিলেন, কারণ তখনো এই জাতীয় রচনার পক্ষে এই টেকনিকের উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল। এতদিন পরে দ্বিধামুক্ত হয়ে যখন তিনি এই জিনিষ দেশের সামে মেলে ধরলেন, তখন এ নিয়ে একটু বিশদ ভাবেই আলোচনা করা দরকার।

ছন্দ ও তান-লয়ের ওজন বাঁচিয়ে, অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের জড়োয়া গহনা ঘাড়ে নিয়ে কবিতা যে সহজ পায়ে চলতে পারে না, তার স্বাভাবিক গতি যে কতকটা পঙ্গু হয় এবং অন্তরের স্বত-উৎসরিত আনন্দটি যে অনেকটা কৃত্রিম হয়ে পড়ে, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাজেই লৌকিক সুরের এই সুলভ কল-গুঞ্জন পরিহার করে, কবিতার মধ্যে যদি বলিষ্ঠতর, নূতনতর গতিবেগ সঞ্চারিত করা যায়, তাহলে শব্দগত

music-এর পরিবর্ত্তে মর্ম্মগত বৃহত্তর music স্ফূর্ত্তি হবার সুযোগ হয়, এ কথাও পরীক্ষিত হয়েছে কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, ডি এইচ লরেন্স প্রমুখের হাতে। কবিচিত্তের অত্যুগ্র ভাবাবেগকে সৌখীন শব্দ-লালিত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে, তাকে তাল-মাত্রার বাঁধাপথে হাঁটাতে গেলে কাব্যের প্রাণ-বস্তু ঘা খায় বলেই বিংশ শতাব্দীর অনেক কবি কাব্যে অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠব চান নি, তাঁরা চেয়েছেন তার প্রাণ-সম্পদের প্রাচুর্য্য, তাই বন্ধাহীন গদ্য-কবিতাই হল বিশেষ করে এ যুগের কবিতা।

ধরা যাক শেষ সপ্তকের এই অংশটি—

বিপুল ঔৎসুক্য আমাকে বহন করে নিয়ে যায় সুদূরে।
বর্ত্তমান মুহূর্ত্তগুলি
অবলুপ্ত করে কালহীনতায়।
যেন কোন লোকান্তরগত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।

এই কবিতাকে যদি ছন্দোবন্ধে বাঁধা হত (সে বলাকার ছন্দই হক না কেন), তাহলে 'ঔৎসুক্য,' 'মুহূর্ত্ত', 'অবলুপ্ত', 'লোকান্তর', 'চক্ষু', 'নিষ্কারণ' প্রভৃতি যুক্তাক্ষরবহুল এবং আপাতদৃষ্টিতে রূঢ় শব্দগুলিকে পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করতে হলে হয়, যথাসম্ভব মোলায়েম করতে হত, না হয় ভারসাম্য রক্ষা করতে এদের প্রত্যেকটি চরণের ওজন মেপে নিতে হত। যে কোন ভাবেই হক, একটা কৃত্রিম বিন্যাস-

পদ্ধতির ছকে পড়ে প্রাণের কথাগুলির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ ব্যাহত হত। এই যে কৃত্রিমতা, এর বিরুদ্ধেই আধুনিক কবির প্রধান আপত্তি।

বিংশ শতাব্দীর কবিরা বলেছেন, কাব্যে এই কৃত্রিমতা বজায় রাখার কোনই সমর্থন নেই। এ ছাড়া কাব্যের যে একটা বিশেষ ভাষা আছে, কতকগুলি বিশেষ ম্যানারিজম আছে, সেগুলিরই বা সার্থকতা কি? আমরা যে ভাষায় কথা বলি, ভাবি, চিন্তা করি, কাব্যের ভাষা তা থেকে অত তফাৎ হবে কেন? এই কথা আরো বেশী করে খাটে বাংলা কাব্য সম্বন্ধে—বাংলা কাব্যে প্রচলিত অসংখ্য নাম-ধাতু, অব্যয় ও সর্ব্বনামের ছড়াছড়ি রয়েছে, যা গদ্যে কদাচ চলে না। এর ওপর কাব্যের গঠনেও আমাদের এমন একটা বিশেষ জাতের কামনীয় ঢং আছে, যার ফলে কেবল কোমল কান্তপদাবলীই বাংলা ভাষায় জুত করে লেখা চলে। কিন্তু এই যুক্তির পেছুনে যে কথাটা রয়েছে, সেটাও এই সঙ্গে প্রণিধান করা দরকার। কাব্যের আসরে আজ যদি গদ্যকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় (সে গদ্য যতই সুরেলা হক), তাহলে তার বিষয়-বস্তু বা দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন চাই, নইলে কাব্যের দেহে ও প্রাণে সামঞ্জস্যের অভাব ঘটবে না কি? ছন্দোবদ্ধ কাব্যে যা বলা যায় না বা যায় নি, তাই বলার উদ্দেশ্যেই ছন্দ-মুক্ত কবিতার জন্ম, নইলে আর তার সার্থকতা কি?

কিন্তু শেষ সপ্তকের কবি-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত দৃষ্টি-ভঙ্গী থেকে স্বতন্ত্র নয়। বিষয় নির্ব্বচনের দিক থেকেও এরা কোন লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তা নয়। অভ্যস্ত ছন্দের মিল ও ধ্বনিসাম্য বর্জ্জন ছাড়া আর সব দিক দিয়েই এর কবিতাগুলি কবির পরিণত জীবনের কাব্যগুলির (পূরবী, মহুয়া, বনবাণী) সমগোত্রীয়। যেমন—

তারা কোন্ প্রথম প্রত্যুষের আলোকে
কোন গুহা থেকে বেরোলো,
অসংখ্য পাখা মেলে ঘুরে বেড়াতে লাগলো চক্রপথে
আকাশ থেকে আকাশে।

এই শ্রেণীর কবিতায় মিল জুগিয়ে দেওয়া খুবই সহজ—যতি-সংস্থান এবং মাত্রা-বিভাগ ত প্রায় তৈরীই আছে, আর রসব্যঞ্জনার দিক থেকেও এরা খাঁটি রবীন্দ্রপন্থী। তাই শেষ সপ্তকের বেশীর ভাগ স্থানেই টেকনিক তার সার্থকতা হারিয়ে নিতান্তই একটা ব্যতিক্রমে পরিণত হয়েছে। হুইটম্যানের কাব্যে আমরা মতবাদের তূর্য্যধ্বনি ও শাণিত উক্তির অসি-সঞ্চালন দেখেই সন্তুষ্ট। কিন্তু শেষ সপ্তক যে কলালক্ষ্মীর নৃত্যের আসর—কাজেই এখানে নূপুরনিক্কণকে ত বাহুল্য মনে হবার কোন কারণ নেই! বরং ছোট-বড় লাইনে ভাগ করে পদ্য-কবিতার মতো সাজিয়ে দেওয়ায় এর কবিতাগুলো পড়া একটু পীড়াদায়কই হয়েছে মনে হল।

কালান্তর

১৩২১ থেকে ১৩৪৩-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতি সম্বন্ধীয় যে প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়, আলোচ্য বইয়ে সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এর প্রথম প্রবন্ধ 'কালান্তর'—তারি নাম অনুসারে সমগ্র বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে। কালান্তরে কবি প্রাক-মহাসমর ইউরোপের রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সমরোত্তর কালে তার যে বিরোধ ঘটেছে, তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভেতর থেকে আজ সত্যিকার মনুষ্যত্ব অন্তর্হিত হয়েছে এবং তার স্থান অধিকার করেছে দুর্নিবার পশুবল—মানুষের অধ্যাত্ম-সম্পদ, তার নিরুদ্বেগ শান্ত জীবনাদর্শ, তার কল্যাণপ্রদ সুস্থ প্রয়াস আজ কালধর্ম্মে পরজাতিদ্বেষ ও বস্তু-সর্ব্বস্ব আত্মবিস্তার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়েছে। বিজ্ঞানে, দর্শনে, সাহিত্যে, আজ সগর্ব্বে সেই বর্ব্বরতা ঘোষণা করাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ইউরোপীয় সভ্যতার মূলকথা—খৃষ্টীয় নীতিশাস্ত্র আজ উঠেছে কুলুঙ্গীতে, তার স্থানে দেখা দিয়েছে নিরাবরণ পাশবিকতা, যা শুধু চায় গ্রাস করতে এবং তাই করে যা ঘোষণা করে কালচারের মহিমা। এ-ই হল সত্যিকার কালান্তর, যার অক্ষুণ্ণ দাপটে সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, ধর্ম্ম—মানুষের বহু যুগের বহু তপস্যায় যাদের উৎপত্তি, তা উল্টে-পাল্টে ভেঙে-চুরে একাকার হতে চলেছে। সুতরাং নবযুগের বহু আড়ম্বরময় এই আধুনিকতা একান্তই স্থূল—এ শুধু ফেঁপে উঠেছে বস্তুর সঞ্চয়ে, এর ভেতর থেকে গেছে বিরাট একটি ফাঁক, যা দিয়ে ঝলকে ঝলকে জল ঢুকে ইউরোপীয় সভ্যতার সৌধ-প্রাচীরে ফাটল

ধরাচ্ছে—অতএব একদিন সমগ্র প্রাসাদের আকস্মিক ভূ-পতন ঘটবেই, ঘটা অনিবার্য্য। কালান্তর সেদিন কালান্তক হয়ে দাঁড়ানো আশ্চর্য্য নয়।

কবির এ বিশ্লেষণ যে অত্যন্ত নিপুণ তাতে সন্দেহ নেই। ইউরোপেও আজ থেকে থেকে গেল গেল শব্দ হচ্ছে—এই গেল গেল ভাবটা অনেক দিন থেকে চলেছে বলেই এটা সত্যি না, এমন নয়। ফাউষ্ট যে শয়তানের সহায়তায় অমিত শক্তিধর হয়েছিল, দক্ষিণাস্বরূপ সেই শয়তানের হাতে আত্মবলি দিয়েই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল—মাঝপথে তার থামার উপায় ছিল না। ইউরোপের বস্তু-মুখী রাষ্ট্রবুদ্ধি তাকে যে অসীম প্রতাপ দিয়েছে, তার পেছনে সাধনা ছিল অশিব শক্তির, তার মূল্যও হয়ত তাকে দিতে হবে। কারণ সর্ব্ববিধ সদ্বুদ্ধিকে ছাপিয়েই ত আজ একথা বারবার ধ্বনিত হচ্ছে যে আবার যুদ্ধ চাই, তাতে ভালো মন্দ যা হয় হক! সুতরাং একথা আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার ভেতর কোথাও এমন একটা দুষ্টক্ষত রয়ে গেছে, যা দুশ্চিকিৎস্য। বলা বাহুল্য প্রাক-মহাসমর ইউরোপে এ জিনিষ কল্পনাতীত ছিল, তখন পরস্পরকে ডোবাবার জন্যে এমন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ওরা গলা কামড়া-কামড়ি করেনি। ফরাসী বিপ্লবও সে হিসাবে বার দুই একটু সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিতে নাড়া দিয়ে গিয়েছে মাত্র, তার বেশী কিছুই করেনি। কাজেই এ যে কালান্তর তাতে আর সন্দেহ নেই।

কিন্তু বিগত বিশ বৎসরের ভেতর ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাসে কালান্তরটা যত প্রত্যক্ষ, আমাদের দেশে তত নয়। আমাদের মাথার ওপর দিয়েও ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বিপুল ঢেউ বয়ে গেছে বটে, কিন্তু

তা আমাদের তটভূমিকে গভীর ভাবে স্পর্শ করেনি—আমাদের সীমান্ত দেশ পার হয়ে আরো অনেক ঊর্দ্ধে রাশিয়ার ঊষর মাটিতে এই ঢেউ পড়ে ভেঙেছে এবং তাদের ভূমিকে উর্ব্বর করেছে। আমরা মহাযুদ্ধকে অনুভব করেছি একটা দুনিরীক্ষ্য দূরগত উপপ্লব রূপে—যা আমাদের চাল ও কাপড়ের দাম চড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের কণ্ঠরোধ করে সমর-ঋণ আদায় করেছে, আর অনুভব করেছি পরোক্ষভাবে ও-দেশী সাহিত্যের আদর্শ-বিপর্য্যয় থেকে। অর্থাৎ এটা আমাদের পক্ষে একান্তই পরোক্ষ ছিল সেদিন—যদিও আজ বুঝি, ব্যবসার বাজারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে অল্পসংখ্যকের ধনবৃদ্ধির দ্বারা বিশ বৎসরে গোটা দেশের নিরন্ন হাড়-পাঁজরা এমন করে বের করে দেওয়ার পেছুনে হাত ছিল মহাযুদ্ধেরই সব চেয়ে বেশী! সেদিন আমরা তেমন বুঝিনি, আর বুঝলেও কি-ই বা প্রতিকার ছিল ?

আমাদের দেশে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্বন্ধ ব্যাপক ভাবে কোন কালেই ছিল না—অতীত বাংলার ইতিহাসে সমগ্র দেশের ওপর একটা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল বলে শোনা যায় না—কাজেই দেশ ছিল তার গৃহ নিয়ে, রাজা ছিল রাষ্ট্র নিয়ে। সেই সনাতন দ্বৈত-যাত্রার ওপর প্রথম আঘাত পড়ে মহাযুদ্ধের অল্প আগে এবং ইউরোপের কাছে ধারকরা কড়ি নিয়েই আমাদের প্রথম জাতীয় এক্সপেরিমেণ্ট। আমি বলছি স্বদেশী আন্দোলনের কথা। তার পেছুনে জিদ ছিল, ত্যাগ ছিল, সাহস ছিল, ছিল না প্রাণের সঞ্চয়—কাজেই সেই বিপ্লবের ব্যর্থ বুদ্বুদ অচিরে বিদীর্ণ হয়ে দেখালো, গুটি কতক সাহেব মারাই জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষে চরম বা পরম নয়—নিজেদের তৈরি করে তোলা দরকার—নিজেদের অপ্রবুদ্ধ মন, অপটু

অস্তিত্ব, অস্ফুট জাতীয় চেতনা, সংস্কারের ও কু-আচারের বেড়াজাল ঘেরা কুণো মনোভাব আমাদের পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির চেয়ে বড় বাধা, তা তিরোহিত না হলে বৃথা এই ছেলে খেলা। সে আন্দোলন নিষ্ফল হল, কারণ তা দেশের অন্তর থেকে উৎসারিত হয় নি, হয়েছিল দু-চারটি ইংরেজী শেখা তরুণের মাথা থেকে—বাকী সমস্ত দেশই তখনো ছিল ঘোরতর নিষ্কর্ম। সুতরাং মহাযুদ্ধটাকে চাকা হিসাবে গ্রহণ করে আমরা জাতীয় জীবনের মোড় ফেরাতে পারিনি—সেদিকে হুঁসই হয় নি আমাদের।

এই বইয়ের 'বিবেচনা-অবিবেচনা' প্রবন্ধে কবি এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। আমাদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে যে চক্ষু-কর্ণহীন রক্ষণশীলতা বহুযুগের জীর্ণ নামাবলী গায়ে আমাদের সর্ব্ববিধ অগ্রগতির পথ আটক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাকে কবি অত্যন্ত কড়া ভাবে আঘাত করেছেন এই প্রবন্ধে। এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সবাই বোধ করি একমত যে এই ঘুণধরা বৃদ্ধত্ব আমাদের চিন্তার বুকে ভারী পাথরের মতো জেঁকে বসে আছে, এবং তা আছে বলেই বাইরের কোন স্বাস্থ্যকর হাওয়াই আমাদের গায়ে লাগে না। 'লোকহিত' এবং 'ছোট-বড়' প্রবন্ধেও কবি এই মনোভাবকে ব্যাখ্যা করে দেখাতে চেয়েছেন। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা-চেষ্টা, তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অর্থ হারিয়ে কি ভাবে গতানুগতিক ধারায় দিনের পর দিন নিস্ফল আবর্ত্ত সৃষ্টি করে এক জায়গাতেই পাক খেয়ে ফিরছে, তা কবির চেয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে কেউই দেখাতে পারতেন না। এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রায় বিশ বছর পূর্ব্বের রচনা—কিন্তু আজো এর প্রত্যেকটি কথা বর্ণে বর্ণে খাটে, হয়ত আরো ঢের দিন খাটবে। কারণ এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে

পৃথিবীতে বহু দেশের ভৌগোলিক সংস্থান এবং আত্মিক ঐতিহ্য ওলট-পালট হয়ে গেলেও আমরা যথারীতি টি'কে আছি, এই থাকাটা নাকি আমাদের পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যের জোর। বস্তুত এর গ্লানিটা যে কত বড়, কবি সেদিকে আমাদের অবহিত করে দিয়েছেন। এই যে দেশে রেল, ষ্টিমার, মোটর, কল-কারখানা, প্রাসাদ, অট্টালিকা, পলিটিক্স, সাময়িক পত্রিকা, ইউনিভার্সিটি, মিউনিসিপালিটি আরো কত কি হয়েছে, এ করেছে অন্যে—এদের প্রসার আমাদের জীবনের বাহিরেই সীমাবদ্ধ। আমাদের অন্তরদেশে আজো অক্ষুণ্ণ তেজে সনাতন আটচালাই মাথা তুলে রয়েছে—আমরা এক চুলও এগোইনি, তাই আমাদের সর্ব্ববিধ আন্দোলন-আলোড়নই কৃত্রিম—ওদের জন্ম আমাদের প্রাণের তাগিদে নয় —এ কথা যত লজ্জারই হক, সত্যি কথা। কাজেই এরা কোন দিন সুফল কিছুই আনতে পারে নি। আমরা পরানুকরণে রাতারাতি মাতামাতি করেছি, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের পুঁজি শেষ হয়ে গেছে—অমনি আমরা ধূলোর মতো গা থেকে সমস্ত আন্দোলন ঝেড়ে ফেলে গৃহ-কোণে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

সমস্যা এই, কিন্তু সমাধান কি তা কবি দেখান নি। সেটা সংস্কারকের কাজ। সেদিকে আজো বৃথা প্রত্যাশায় পথ চেয়ে থাকা ছাড়া হয়ত উপায় নেই।

'সমস্যা', 'বাতায়নিকের পত্র', 'শক্তিপূজা' প্রভৃতির মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক গান্ধী-আন্দোলন সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কবি দু'একটি ইঙ্গিত করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনটা আমাদের শৈশবের ব্যাপার—কিন্তু এই আন্দোলন কালে আমরা নেচেছি, যদিও বুঝেছি এ নাচের অর্থ শুধু নাচই, কারণ দেশের পূর্ণাঙ্গ নাড়ীর যোগ ছিল না এর সঙ্গেও। দলে

দলে ছেলে-মেয়ে জেলে গেছে, লাঠির তলায় মাথা দিয়েছে, স্কুল-কলেজ কাজ-কারবার ছেড়েছে, কিন্তু তাদের সামনে কোন লক্ষ্য ছিল না, কোন গঠনমূলক পদ্ধতি ছিল না—সুতো কেটে, হরতাল করে, আরো এই জাতীয় নানা বাজে কাজ করে, অযথা শক্তিক্ষয়ের ফলে সমস্ত দেশই অচিরে ক্লান্ত হয়ে একেবারে ঝিমিয়ে পড়লো, তার সেই অবসাদের সুযোগে কখন গলায় নূতন শাসন-সংস্কারের লোহার হাঁসুলি চড়েছে, তা কেউ টেরই পায়নি! জালিয়ানওয়ালাবাগের উৎপীড়নকে উপলক্ষ্য করে যে সাময়িক চাঞ্চল্যে এর জন্ম, তার সঙ্গে খিলাফতের রসায়ন মিশেল দিয়ে চলনসই রকম একটা পলিটিক্যাল পথ্য তৈরী করা হয়েছিল—বিচক্ষণ বৈদ্যের হাতে তা মহিমান্বিত চেহারা ধরলেও, আসল রোগের তাতে আসান হল না, তার কারণ রোগটা বহুজীর্ণ এবং পুরুষানুক্রমিক। ওর সংস্কার সম্ভবই নয় হয়ত।

কবি বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেয়েছেন এই রোগটা কোথায়। তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন, এই রোগটা পলিটিক্যাল মার্কামারা হলেও, এর আসল বিস্তারক্ষেত্র হচ্ছে আমাদের গৃহ। এরই সীমানার মধ্যে এটা অদৃশ্য প্রেতের মতো উপদ্রব করে ফিরছে—আমরা তার আভাস পাই, উদ্দেশ পাইনে। বলা বাহুল্য আমাদের সমাজের এই জীর্ণ পাঁজরে আর খাড়া হয়ে দাঁড়ানোর বল নেই—আমাদের কৃষি নেই, বাণিজ্য নেই, শিক্ষা সীমাবদ্ধ, স্বাস্থ্য লুপ্ত—আমাদের নূতন করে সহজ করে নিজেদের সমস্যাগুলোকে যাচিয়ে বাজিয়ে নেবার মতো শক্তি বা সাহসও নেই। অথচ দিনের পর দিন অন্ধের মতো আমাদের এই ভাঙাচোরা জিনিষটাকেই আঁকড়ে চলতে হচ্ছে—দীর্ঘ দিনের অভ্যাসে এর ভগ্নদশাটাও আমাদের চোখ এড়িয়ে গেছে। তারই ফলে

বহু আবর্জ্জনা এর অলিতে-গলিতে জমে উঠেছে, তাও আমাদের কাছে পুরাতনের গৌরবে সমৃদ্ধ। তাই কবি বলেছেন, বিচারের চেয়ে আচারকে আমরা বড় করেছি—আমরা মানুষকে চিনিনি, চিনেছি তার সাময়িক খেয়ালখুসীকে, এবং তাকেই দিয়েছি ষোল-আনা শ্রদ্ধার উপচার। তাই বলা যেতে পারে,আমাদের জাতীয় জীবনে কালান্তর আজো আসে নি—আজো আমাদের চলছে পূর্ব্বতনের একটানা ঢিমেতালা গতি।

তবে কালান্তরে আর বিলম্ব নেই। ধনিক ও শ্রমিকের মাঝখানকার যে বৃহৎ স্তরটা, যেটাকে বলে মধ্যবিত্ত, আসলে এ দেশে যেটা গরীব সম্প্রদায়—যার অবলম্বন চাকরি—তাতে কন্যাদায়, শিক্ষাদায়, জাত্যভিমান আরও বহু অবাঞ্ছিত জিনিষের ভীড় জমেছে, যা অপ্রতী-কার্য্য। এই ভাবেই ক্রমে এই সম্প্রদায়টা ধ্বংস হবে। তারপর মাঝখানের এই স্তরটা সরে গেলেই প্রথমে ও তৃতীয়ে যে একটি বিপুল ঠোকাঠুকি বাধবে, তাতে আমাদের জাতির ভাগ্য হয়ত বদলালেও বদলাতে পারে। সেদিন এই কৌলীন্যের গর্ব্ব, এই সনাতনতার গর্ব্ব, এই নিশ্চেষ্ট রক্ষণশীলতার গর্ব্ব হয়ত দূর হবে, কিন্তু সেদিন থাকবেন না কবি—আর থাকবো না আমরা, তাঁর অনুগামীরা।

সাহিত্যের পথে

'সাহিত্য ধর্ম্ম' ও 'সাহিত্যের নবত্ব' কবির এই দুটি প্রবন্ধ নিয়ে বছর বারো আগে এদেশে ভয়ানক হৈ-চৈ হয়ে গেছে। এই দুটি প্রবন্ধে এবং এদের অনুপূরক 'বাস্তবতা', 'সাহিত্য বিচার', 'আধুনিক কাব্য', ইত্যাদি প্রবন্ধে আধুনিকতা সম্বন্ধে কবির একটি সুস্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় এবং সে অভিমত আধুনিকতার প্রতিকূলে।

কবি মোটামুটি যা বলেন তা হচ্ছে এই যে যা প্রত্যক্ষ, যা স্থূল, যার উদ্ভব প্রয়োজনে, নয়ত উত্তেজনায়, যার প্রসার ইন্দ্রিয় সীমায় আবদ্ধ— এমন জিনিষ সাহিত্য নয়। এমন জিনিষ নিয়ে যখন সাহিত্য সৃষ্টি করতে যাওয়া হয়, তখন স্বভাবধর্ম্মেই তা কৃত্রিম হয়ে দাঁড়ায়—তার বহিরঙ্গিক জৌলুষ সাম্প্রতিকের মনোহরণ করে বটে, কিন্তু চিরন্তন মানব-মনের সঙ্গে তার মেল-বন্ধন হবার সম্ভাবনা কম। কাজেই বাস্তব-ঘেঁষা এই আধুনিকতা সাহিত্যকে কোন ক্রমে জলাচরণীয় রাখলেও, তার আভিজাত্য নষ্ট করেছে। এই সঙ্গে কবি একথাও বলেন যে সত্যিকার সাহিত্যের পক্ষে বিগত কালের প্রশ্নও যেমন নিরর্থক, আজকের প্রশ্নও তেম্নি অর্থহীন। আজো যা সাহিত্য তা এনামেল করা ফ্যাসানের জোরে নয়—তার অন্তর-সম্পদের জোরেই। যা প্রকৃত রসাদর্শ থেকে ভ্রষ্ট, তা হট্টগোল করে যতই বাজার মাৎ করুক, আসলে তা খেলো জিনিষ।

বলা বাহুল্য একথা প্রতিবাদ সাপেক্ষ। কিন্তু একথা বলেছেন এমন

কেউ, যাঁর প্রতিবাদে লেখনী ধরতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ হয়। তবু যে কথাটা এই প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম মনে আসে, তা না বললেও অন্যায় হবে মনে করি। একথা অবশ্যই ঠিক যে সাহিত্য শুধু বর্ত্তমানের জন্মে নয়, আজকের যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাল তা না-ও থাকতে পারে, সুতরাং কেবল আজকের দিকে বদ্ধদৃষ্টি হয়ে সাহিত্য রচনা করলে, তা প্রয়োজন সাধনের অন্যান্য বাস্তব উপকরণগুলির মতোই একদিন বাসি হয়ে যাবে—তাই সাহিত্যের লক্ষ্য গভীরতর সুদূরতর হওয়া দরকার। কিন্তু একথাও ঠিক যে মানুষের মন একটি বিশেষ কেন্দ্রে যুগ যুগ ধরে আবদ্ধ থাকে না—তার পরিবর্ত্তন হয়ই। হয় ভেতরকার পরিবর্ত্তন তার বাইরের ফ্যাসানকে বদলে দেয়, নয় বাইরের অবস্থান্তর তার ভেতরে নিয়ে আসে পরিবর্ত্তনের স্রোত। এ না হলে গুহাবাসের আদিমতা থেকে মানুষের মুক্তিই ছিল না কোনদিন। সুতরাং সাহিত্যের আদর্শ-বিপর্য্যয়কেও অস্বীকার করা যায় না। যেটাকে বিপর্য্যয় বলা হচ্ছে, তা যে কেবলমাত্র ফ্যাসানের খাতিরেই জন্মেছে তা নয়—তার ঐতিহ্য ঘটনাক্রমে এমন ভাবেই পরিবর্ত্তিত হয়েছে যে তার পক্ষে এই বিপর্য্যয়ই হয়েছে স্বাভাবিক। তাছাড়া এটা বিপর্য্যয়ই বা কেন?

প্রকাশ্য রাজপথে যে কেবলমাত্র দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্মে চীৎকার করে, সে হয়ত উপহাসাস্পদ। কিন্তু দস্যুহস্তে হৃতসর্ব্বস্ব হয়ে যে চীৎকার করে, তার কি চীৎকারের সঙ্গত অধিকার নেই? হয়ত নিস্তব্ধতাই তার পক্ষে শোভনতর নাগরিকতার পরিচায়ক হত, কিন্তু মানুষের হৃদয়-ধর্ম্মের তা বিরোধী। তথাকথিত আধুনিকতা এই হৃদয়-ধর্ম্মের অনুগমনকেই বড় করে দেখছে, আর এখানেই তার ভূতপূর্ব্বের সঙ্গে

বিরোধ। এ বিরোধের হয়ত কোনদিন মীমাংসা হবে, কিন্তু সেদিন আমরা কেউই থাকবো না।

আধুনিকতার অজুহাতে অনেক মেকী জিনিষও মাথা তুলেছে সন্দেহ নেই এবং তাদের পরমায়ুও যে সীমাবদ্ধ, সে কথাও সুনিশ্চিত। কিন্তু তারি সঙ্গে এমন জিনিষও হয়ত আসছে, যার স্থিতি সাম্প্রতিকের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকবে না। একথা জোর করে বলার আজ প্রয়োজন হয়েছে এই জন্যে যে ক্রিয়ায় কর্ম্মে, চিন্তায় চেষ্টায়, দর্শনে বিজ্ঞানে, আজ পূর্ব্বতনের সঙ্গে আমাদের একটা স্পষ্ট বিরোধ ঘটে গেছে, এক পারে তাঁরা, আর এক পারে আমরা—মাঝখানের এই শূন্যতাকে পূর্ণ করে শুধু তরঙ্গিত হচ্ছে বিক্ষোভ আর বিরোধ, যার সমাধান হওয়া দরকার।

স্বীকার করি মানুষের মনে সুন্দরের ক্ষুধা, অতি-প্রাকৃতের ক্ষুধা আছেই—আজকের লক্ষ বিভোক্ষের ভেতরও তা আছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই জেগে উঠেছে অন্যান্য ক্ষুধা, যা হয়ত আগেও ছিল, কিন্তু সম্মানার্হ বা স্বীকৃত ছিল না বলেই সাহিত্যে তাদের দেখা পাওয়া যায় নি। আজকের সাহিত্য তাদের স্বীকার করছে, নূতন বলে একটু বেশী করেই করেছে বলতে পারি। একে সুন্দরের চিরন্তনতা থেকে অসুন্দরের সাময়িকতায় লাফিয়ে পড়া বলতে পারি না—এ একটা নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী, যা যুগধর্ম্মে আপনিই আত্মপ্রকাশ করেছে।

যন্ত্র-বিজ্ঞানের নানামুখী আবিষ্কার ও প্রসার যেমন আজ মানুষকে বহুবিধ প্রাকৃতিক বাধার ওপর দিয়েছে আধিপত্য, তেমনি মনোবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও দর্শনের নবতন দৃষ্টি-ভঙ্গী তার জীবনাদর্শকেও আমূল ঢেলে সেজেছে। ভেতরে-বাইরে যুগপৎ এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে থেকে তার

সাহিত্যিক আদর্শ অবিকৃত থাকতে পারে নি—তা পারা স্বাভাবিকও নয়। কিন্তু তাতে সাহিত্যের প্রাণ-সম্পদ বৃহত্তর পরিণতির পথেই এগুচ্ছে কিনা কে জানে? কুঙ্কুম, কাজল, দুকূল বসন বা মেখলা-মঞ্জীরের স্থানে রুজ, পাউডার, ব্লাউজ, হাই হিল আমদানীর মতো সাহিত্যের আধুনিকতাকে আমরা নিতান্তই বহিরঙ্গিক ব্যাপার বলতে পারি না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে আধুনিকতা সম্বন্ধে এত বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন কি ছিল, এ প্রশ্ন অনেকে করতে পারেন। যাঁরা কবির ইদানীন্তন প্রবন্ধ-সাহিত্য পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে আধুনিকতা বনাম চিরন্তনতা নিয়ে কবি যে সমালোচনার সূত্রপাত করেছেন, তাতে প্রকারান্তরে আমাদের এই আলোচনায় হস্তক্ষেপ করতেই বলা হয়েছে। কবির আধুনিক গদ্য রচনা বুঝতে হলে এ আলোচনার প্রয়োজন তাই কম নয়।

বাল্যকবিতা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচনা বলতে বহুদিন পর্য্যন্ত 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ভানুসিংহের পদাবলী' প্রভৃতি কবিতা পুস্তক, 'বৌঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাস, 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' প্রবন্ধ, 'বাল্মীকি প্রতিভা' গীতি নাট্য প্রভৃতি বইকে বোঝাতো—কারণ রবীন্দ্রনাথের মুদ্রিত রচনাবলীর মধ্যে একেবারে গোড়ার পর্ব্বের লেখা হিসাবে এই গুলিকেই পাওয়া যেত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই গুলিই রবীন্দ্রনাথের প্রথমতম রচনা নয়। আমরা আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-রচনা সুরু করেন মাত্র তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে—আর তখন থেকেই তাঁর রচনা ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হতে থাকে। সেইখান থেকে সুরু করে উল্লিখিত পর্ব্ব পর্য্যন্ত আসবার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আরো অনেক কিছু লিখেছিলেন, একত্র করলে যার পরিমাণ প্রায় পাঁচশো পাতা অতিক্রম করে যায়। সেই রচনাগুলি হল যথাক্রমে 'বনফুল', 'ভগ্নহৃদয়', 'কবি কাহিনী', 'রুদ্রচণ্ড', 'করুণা', 'বিবিধ প্রসঙ্গ', 'নলিনী', 'কালমৃগয়া', 'শৈশব সঙ্গীত' ইত্যাদি। এর মধ্যে প্রথম তিনখানি কাব্য-কাহিনী, চতুর্থ খানি নাট্যকাব্য, তৎপরবর্ত্তী বইটি উপন্যাস, বিবিধ প্রসঙ্গ প্রবন্ধ সঙ্কলন এবং অবশিষ্ট দু'খানি যথাক্রমে গদ্যনাটিকা ও গীতিনাট্য, আর সর্ব্বশেষখানি লিরিক ও গাথা কবিতার সমষ্টি। এই বইগুলি কবি লিখেছিলেন চোদ্দ থেকে আঠারোর মধ্যে এবং এর ভেতর 'করুণা' ছাড়া আর সবগুলি রচনাই পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, 'করুণা' শুধু 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় কিছুদিন প্রকাশিত হয়েই বন্ধ হয়ে যায়। এই খানে বলে রাখা যেতে

পায়ে যে 'বনফুল' প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' নামক একটি সেকালের মাসিক পত্রে, 'ভগ্নহৃদয়' ও 'কবিকাহিনী' ভারতীতে, অবশিষ্টগুলির মধ্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র প্রবন্ধ সমূহও ভারতীতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। আর সবগুলিই একেবারে বই আকারে বের হয়।

এই পর্য্যায়ের রচনাবলীকে কবি পরে সম্পূর্ণরূপেই বাতিল করে দিয়েছেন। এমন কি 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' দিয়ে যে পর্কের সুরু, তার পুনঃ প্রকাশও তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। ১৩৩৮ সালে সম্পাদিত 'সঞ্চয়িতা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—'আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিতপদে চলতে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌছয়নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।...যে কবিতা গুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি, তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোন নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি লেখা যখন থেকে কবিতা হয়ে উঠেছে, তখন থেকেই তার ইতিহাস।...'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান' এখনো বই আকারে চলছে একে বলা যেতে পারে কালাতিক্রমণ দোষ। ঐ তিনটি কবিতা গ্রন্থের আর কোন অপরাধ নেই, কেবল একটি অপরাধ, লেখাগুলি কবিতার রূপ পায়নি। ডিমের মধ্যে যে শাবক আছে সে যেমন পাখী হয়ে ওঠেনি এটাতে কেউ দোষ দেবে না, কিন্তু তাকে পাখী বললে দোষ দিতেই হবে।...'ভানুসিংহের পদাবলী' সম্বন্ধেও সেই একই কথা। 'কড়ি ও কোমলে' অনেক ত্যাজ্য জিনিষ আছে, কিন্তু সেই পর্ব্বে আমার কাব্য-ভূ-সংস্থানে ডাঙা জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। তারপর 'মানসী' থেকে আরম্ভ করে বাকী এবগুলির কবিতায় ভালো-মন্দ-মাঝারি ভেদ

আছে, কিন্তু আমার আদর্শ অনুসারে ওরা প্রবেশিকা অতিক্রম করে কবিতার শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে।'

বলা বাহুল্য কবির এ মন্তব্য এক হিসাবে সত্য, কিন্তু যে রচনাবলী ভূ-প্রোথিত ভিত্তি রূপে রবীন্দ্র-সাহিত্যের সমগ্র ইমারতটিকে ধারণ করে রয়েছে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমালোচকের কাছে তার মূল্য বড় কম নয়। যে দৃষ্টি-ভঙ্গী, প্রকাশ-রীতি ও অলঙ্করণ-পদ্ধতি রবীন্দ্র-সাহিত্যে কুললক্ষণ রূপে সর্ব্বজন বিদিত, সূচনায় তাদের কি রূপ ছিল এবং ক্রম-বিকাশের ধারায় পরের পর অগ্রসর হয়ে কি ভাবে তারা পূর্ণ পরিণতিতে পৌছুলো, তা অনুসন্ধান করা দরকার এবং সেইজন্যেই 'সন্ধ্যা সঙ্গীত' পর্ব্ব ত নয়ই, তার আগের পর্ব্বকেও বাতিল করা যায় না। আনন্দের বিষয়, এই রচনাগুলি একত্র হয়ে সম্প্রতি রবীন্দ্র-রচনাবলী 'অচলিত সংগ্রহ' নামে প্রকাশিত হয়েছে। এতে 'ভারতী'তে প্রকাশিত কবির 'গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ', 'স্যাক্সন ও নর্ম্যান সাহিত্য', অসমাপ্ত 'করুণা' উপন্যাস ইত্যাদি কয়েকটি রচনা ছাড়া, কবির সমস্ত বাল্য রচনাই কালানুক্রমে গ্রথিত হয়েছে।

বলা অনাবশ্যক যে নিছক সাহিত্যের দিক থেকে এই সমস্ত বইয়ের আজ আর সমালোচনা করা যেতে পারে না।

কাব্য-কাহিনী ও নাটক-নাটিকাগুলির কথাই আগেই বলি। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' ও 'ভগ্নহৃদয়' তিনই হল হতাশ প্রণয়ের কাহিনী—ভাবপ্রবণ একটি তরুণ ও একটি তরুণীর ভালোবাসা কি ভাবে সমাজ-বাধা অতিক্রম করতে না পেরে ব্যর্থ হল, তারই গল্প এই তিনটি বইয়ে সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। এদের প্লট, পদ্ধতি ও আঙ্গিক প্রায় এক জাতের। ঘটনা-বিন্যাস ও চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে এখানে প্রত্যাশা করবার

কিছু নেই। বাস্তব জ্ঞান ও গভীর জীবন-নীতিও এতে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু এই অপরিণত বয়সের রচনাতেও প্রকৃতির সঙ্গে কবি-হৃদয়ের সুনিবিড় যোগটি স্পষ্ট করেই অনুভব করা যায়। কয়েকটি নিদর্শন উদ্ধৃত করছি—

তুই স্বরগের পাখী পৃথিবীতে কেন?
সংসার কণ্টক বনে পারিজাত ফুল,
নন্দনের বনে গিয়া, গাইবি খুলিয়া হিয়া,
নন্দন মলয় বায়ু করিবি আকুল!
আয় তবে ফিরে যাই বিজন শিখরে,
নির্ঝর ঢালিছে যেথা স্ফটিকের জল,
তটিনী বহিছে যথা কল কল স্বরে,
সুবাস নিশ্বাস ফেলে বনফুল দল।
বনফুল ফুটেছিলি ছায়াময় বনে,
শুকাইলি মানবের নিঃশ্বাসের বায়ে,
দয়াময়ী বনদেবী শিশির সেচনে
আবার জীবন তোরে দিবেন ফিরায়ে।

—বনফুল

কিংবা—

সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুকতারা ধীরে ধীরে যথা
ক্রমশঃ মিশায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন।

শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস,
হু-হু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিঃশ্বাস।
সমাধি উপরে তার তরুলতা কুল
প্রতিদিন বরষিত কত শত ফুল!
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

—কবি কাহিনী

অথবা—

নীরব রজনী দেখে মগ্ন জ্যোছনায়।
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো।
ঘুমঘোরময় গান বিভাবরী গায়,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!
নিশীথের সুনীরব শিশিরের সম,
নিশীথের সুনীরব সমীরের সম,
নিশীথের সুনীরব জ্যোছনা সমান
অতি অতি অতি ধীরে কর সখি গান!

নিশার কুহক বলে নীরবতা সিন্ধুতলে
মগ্ন হয়ে ঘুমাইছে বিশ্ব চরাচর,
প্রশান্ত সাগরে হেন, তরঙ্গ না তুলে যেন,
অধীর উচ্ছ্বাসময় সঙ্গীতের স্বর!
তটিনী কি শান্ত আছে, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে,
বাতাসের মৃদু হস্ত পরশে এমনি—
ভুলে যদি ঘুমে ঘুমে তটের চরণ চুমে

সে চুম্বন ধ্বনি শুনে চমকে আপনি।
তাই বলি অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো,
রজনীর কণ্ঠ সাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো!

—ভগ্নহৃদয়

যে অংশগুলি উদ্ধৃত করা হল, তাতে কাঁচা হাতের ও অপরিণত মনের ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এগুলির ভেতর বেশ একটু কবিত্বের ছোঁয়া নেই কি? মানব-সংসারে আছে অবিচার, অত্যাচার, অনৈক্য—জীবনের সহজ গতি, স্বচ্ছ প্রশান্তিকে যা দিচ্ছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নষ্ট করে, কিন্তু প্রকৃতির বুকে রয়েছে অগাধ শান্তি, অকূল মমতা, তাই সংসারবিরাগী কবির হৃদয় খুঁজছে প্রকৃতির সান্নিধ্য, তার ভেতর ডুব দিয়ে তাই ভুলতে চাইছে বাস্তবের শত সহস্র ব্যথা ও বঞ্চনা। কিন্তু সংসার শুনবে কেন? সে তার অনতিক্রমণীয় কর্ম্ম-জাল বিস্তার করেই টানছে মানুষকে, শেষকালে মৃত্যু এসে দিচ্ছে তাকে পরম শান্তি ও চরম সমাধানের নির্দ্দেশ—এই হল মোটামুটি ভাবে তিনখানি কাব্যের এবং এদের পরবর্ত্তী 'রুদ্রচণ্ড' নাট্যকাব্যেরও মূল প্রতিপাদ্য। ছোট বয়সের অনভিজ্ঞ মনে বস্তু-সংসার ও তার বহুমুখে বিক্ষিপ্ত কর্ম্মক্ষেত্র স্বভাবতই আনে একটা আশঙ্কার ভাব—প্রকৃতির মর্ম্ম-লোকে চলছে যে অবাধ স্বাধীনতা ও অগাধ সৌন্দর্য্যের লীলা, তারি ভেতর নিজেকে নির্ব্বাসিত করে বাস্তবকে ফাঁকি দেবার ইচ্ছাও তাই ছোট বয়সেরই ধর্ম্ম।

যে সংসারে—

কেহ বা রতনময় কনক ভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,

অথচ সমুখ দিয়া দীন নিরাশ্রয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্ন সন্ধান।
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লয়ে
সহস্র রক্তের ধারা ক্ষরিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন।

আর—

সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একের দাসত্বে রত অযুত মানব।

—কবিকাহিনী

সেই দুঃসহ মানব সংসারের তুলনায় প্রকৃতির রাজ্য কত বেশী শান্তিময়, কত বেশী সখ্য ও সুবিচার সেখানে! যেমন—

বসন্ত প্রভাতে এক মালতীর ফুল
প্রথম মেলিল আঁখি তার,
চাহিয়া দেখিল চারিধার।
সৌন্দর্য্যের বিন্দু সেই মালতীর চোখে
সহসা জগৎ প্রকাশিল,
প্রভাত সহসা বিভাসিল।
বসন্ত লাবণ্যে সাজি গো,
একি হর্ষ—হর্ষ আজি গো!
ঊষারাণী দাঁড়াইয়া শিয়রে তাহার
দেখিছে ফুলের ঘুম ভাঙা,
হরষে কপোল তার রাঙা।
কুসুম ভগিনিগণ চারিদিক হতে

আগ্রহে রয়েছে তারা চেয়ে,
কখন ফুটিবে চোখ ছোট বোনটির
জাগিবে সে কাননের মেয়ে !

—রুদ্রচণ্ড

'শৈশব সঙ্গীত' নামক কবিতা-সংগ্রহটির কোন কোন রচনাতেও একই দৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই। যেমন—

সোনার পিঞ্জর ভাঙিয়ে আমার,
প্রাণের পাখীটি উড়িয়া যাক।
সে যে হেথা গান গাহে না,
সে যে মোরে আর চাহে না,
সুদূর কানন হইতে বুঝি সে
শুনেছে কাহার ডাক।
যে যায় সে যায় ফিরিয়ে না চায়,
যে থাকে সে শুধু করে হায় হায়,
নয়নের জল নয়নে শুকায়,
মরমে লুকায় আশা।
বাঁধিতে পারে না আদরে সোহাগে,
রজনী পোহায়, ঘুম হতে জাগে,
হাসিয়া কাঁদিয়া বিদায় সে মাগে,
আকাশে তাহার বাসা।

এই কবিতা-সংগ্রহটিতে এবং 'ভগ্নহৃদয়' নাট্যকাব্যে অনেকগুলি ছোট ছোট গান আছে—তাই হল রবীন্দ্রনাথের প্রথম রচিত গানের নিদর্শন। এই গানগুলি রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগীদের অপরিচিত নয়,

কারণ কবির পরবর্ত্তী গানের বইগুলিতে এরা গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু অনেকেই জানেন না এরা কবির কৈশোরের রচনা। কয়েকটি গানের উল্লেখ করছি—'নলিনী খোল গো আঁখি', 'বলি ও আমার গোলাপ বালা', 'কেন গো সাগর এমন চঞ্চল', 'দেখে যা লো তোরা সাধের কানন মোর' ইত্যাদি। এই সমস্ত গান এবং কতকগুলি গাথা-কবিতা, যেমন, 'লীলা', 'ভগ্নতরী', 'ফুলবালা' ইত্যাদিতে ভাবী রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক বিকাশ লক্ষ্য করা গেলেও মোটের ওপর এ সমস্ত রচনা কবির নিজের ভাষাতেই 'অপরিণত'। দুই-এক জায়গায় ওরি মধ্যে অবশ্য ঝলমল করে উঠছে স্ফুটনোন্মুখ প্রতিভার দীপ্তি, যেমন—

নাচিছে ছুটিছে গাহিছে খেলিছে,
শত আঁখি তার পুলকে জ্বলিছে,
দিনরাত নাই কেবলই চলিছে,
হাসিতেছে খল খল!

তরুণ মনের উছাসে অধীর,
ছুটেছে যেমন প্রভাত সমীর—
ছুটেছে কোথায়? কে জানে কোথায়?
তেমনি তোরাও আয় ছুটে আয়,
তেমনি হাসিয়া, তেমনি খেলিয়া,
পুলক উজল নয়ন মেলিয়া,
হাতে হাতে বাঁধি করতালি দিয়া
গান গেয়ে তুই চল!

'প্রভাত-সঙ্গীতে'র 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতার পূর্ব্বাভাষ পাওয়া যায় এই কবিতায়, 'কথা ও কাহিনী'র কোন কোন কবিতারও প্রাথমিক

কাকলি শোনা যায় কোন কোন গাথা-কবিতায়। কিন্তু আমরা আর বেশী নিদর্শন তুলবো না।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ গদ্য কি রকম লিখতেন, অনেকের তা জানার কৌতূহল থাকতে পারে। সেই জন্যে 'বিবিধ প্রসঙ্গ' প্রবন্ধ-সংগ্রহ থেকেও কতকাংশ তুলে দিচ্ছি—পাঠকরা দেখবেন, অত ছেলে বয়সেই গদ্য লেখার বাঁধুনি তাঁর কেমন নিপুণ। যে রচনাটি থেকে উদ্ধৃত করছি, তার নাম 'জগৎ-পীড়া'—'জগৎ একটি প্রকাণ্ড পীড়া। অস্বাস্থ্যকে পরাভূত করিবার জন্য স্বাস্থ্যের প্রাণপণ চেষ্টাকে বলে পীড়া। জগৎও তাহাই—জগৎও অস্বাস্থ্যকে অতিক্রম করিয়া উঠিবার জন্য স্বাস্থ্যের উদ্যম, অভাবকে দূর করিবার জন্য পূর্ণতাকাঙ্ক্ষার উদ্যোগ, সুখ পাইবার জন্য অসুখের যোঝা-যুঝি, জীবন পাইবার জন্য মৃত্যুর প্রযত্ন। জগতের প্রত্যেক পরমাণু পীড়া, কিন্তু সেই প্রত্যেক পরমাণুর মধ্যে স্বাস্থ্যের নিয়ম সঞ্চারিত হইতেছে। এই নিয়ম বর্ত্তমান না থাকিলে জীবন থাকিতে পারে না। অতএব এই জগতের যে চেতনা, তাহা পীড়ার চেতনা।'

এই সমস্ত নিদর্শন থেকে আমরা মোটের ওপর এইটুকু দেখাতে চেয়েছি যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা পরবর্ত্তী কালে সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগেই যে পরিপূর্ণ বেগে প্রবাহিত হবে, তার পূর্ব্বাভাষ তিনি বাল্যেই দিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গী ও প্রকাশ-রীতিতে আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে—কিন্তু তাঁর মতবাদ ও জীবন-দর্শনের কোন কোন দিকের বৈজিক চিহ্ন তাঁর এই সমস্ত বাল্য-রচনাতেও পাওয়া যায়। আর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে ঐ সময়কার নিছক বস্তুধর্ম্মী রচনার জনতা ভেদ করে ধীরে ধীরে একটি

বাল্যকবিতা

প্রাণধর্ম্মী সাহিত্য-দৃষ্টি আপনার পথ আপনি তৈরী করে কি করে এগিয়ে আসছে, এই কাঁচা লেখাগুলোর ভিতর দিয়ে তা-ও টের পাওয়া যায়—তাই এগুলোকে নিছক 'বাল্য রচনা' বলে বাতিল করা যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভার সম্যক বিচার যাঁরা করবেন, তাঁদের কাছে এগুলি তাই অপরিহার্য্য এক-একটি Land-mark স্বরূপ।

ইউরোপ প্রবাসীর পত্র

আমাদের সঙ্গে যখন থেকে সাহিত্যের সম্বন্ধ, গদ্যে ও পদ্যে তখন রবীন্দ্র-প্রভাব পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে—পূর্ব্বতন আদর্শ, বিরুদ্ধ আদর্শ সমস্তই তখন রবীন্দ্র-আদর্শের ভেতর মিশে এক হয়ে গেছে। কাজেই কোন প্রতিকূল আবহাওয়াকে আমরা চেনবার সময় পাইনি। তারপর থেকে এ পর্য্যন্ত আমরা সাহিত্য-রাজ্যে রবীন্দ্রনাথেরই একাধিপত্য দেখা আসছি। তাঁর ছত্রচ্ছায়ায় ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত পাত্র-মিত্রেরই উদ্ভব হল, কিন্তু তাঁর প্রাধান্য ও প্রভাবকে না মেনে চলবার শক্তি হল না কারুরই। যাঁরা অক্ষম আত্মভিমানে তাঁকে স্বীকার না করবার ভান করলেন, তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যই উচ্চকণ্ঠে সেই পিতৃ-ঋণ ঘোষণা করতে লাগলো। আমাদের বাল্যকালে সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের পরই উল্লেখযোগ্য ছিলেন, তাঁরা সকলেই চলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের তৈরী রাজরাস্তা দিয়ে। রবীন্দ্র-ধারা পরিহার না করলে, স্বতন্ত্র কোন সাহিত্যিক আদর্শ গড়ে না তুললে, আমরা কোন দিনই সত্যিকার মর্য্যাদা পাবো না—এ কথা আমরা ইদানীং বলছি বটে, কিন্তু যারাই একথা বলছি, তারাই সতর্ক ভাবে করছি রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ।

কিন্তু এখন থেকে যদি ষাট বছর পিছু হটে যাওয়া যায়, তাহলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কি ভাবে দেখতে পাই? বনফুল, ভগ্নহৃদয়, কবিকহিনী, সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, কড়ি ও কোমল প্রভৃতি কাব্য—প্রকৃতির প্রতিশোধ, বাল্মীকি-প্রতিভা, বৌঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি প্রভৃতি নাটক-উপন্যাস—ইউরোপ প্রবাসীর পত্র, বিবিধ প্রসঙ্গ প্রভৃতি

প্রবন্ধ তখনি বঙ্কিমশাসিত সাহিত্য-গগনে একটি নূতন যুগের অরুণোদয় সূচনা করেছিল বটে, কিন্তু দেশ সেই লোভনীয় অরুণচ্ছটার পেছনে রবির আবির্ভাব উপলব্ধি করতে পারে নি, তাই অভিনন্দনের পরিবর্ত্তে ভবিষ্যতের রবীন্দ্রনাথের ভাগ্যে সেদিন লাভ হয়েছিল অবমাননা। দেশের সেই সর্ব্বতোমুখী বিরোধিতার কুয়াসা ভেদ করে পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভসিত হলেন যে রবীন্দ্রনাথ, আমরা তাঁকে দেখেছি—কিন্তু উদয়-গোধূলির অধ্যবসায়ী রবীন্দ্রনাথ আমাদের কল্পনার বিষয়। কবির স্বরচিত জীবন-স্মৃতিতে তাঁর সঙ্গে আমাদের এক-আধটু পরিচয় হয়—কিন্তু অনেকটাই খুঁজে নিতে হয় সমসাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে।

এই সময়ের রচনা কবি নিজেই বেশীর ভাগ বাতিল করে দিয়েছেন। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত এবং ভানু সিংহের দু'একটি কবিতা ছাড়া আর সবই আজ দুর্লভ। বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষিকে পরে কবি নাটকে রূপান্তরিত করে এদের পূর্ব্বতন অস্তিত্বের ওপর যবনিকা টেনে দিয়েছেন। অন্যান্য বইয়ের প্রকাশও তাঁর অনভিপ্রেত—এ তাঁর স্বমুখেই শুনেছি। কিন্তু রবীন্দ্র-সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠকের কাছে এই রচনাগুলোর মূল্য কম নয়। কাব্যের দিক থেকে মানসী, নাটকের দিক থেকে চিত্রাঙ্গদা, গোড়ায় গলদ, উপন্যাসের দিক থেকে নৌকাডুবি দিয়ে সত্যি সত্যি যে রবীন্দ্রযুগের সুরু, এই রচনা গুলোই হল তার প্রাথমিক ভিত্তি—এই বনিয়াদের ওপরই তাঁর সমগ্র সাহিত্য-সৌধের স্থিতি। অবশ্য এদের অভাবে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুশীলনের কোন ক্ষতি হয়, এমন কথা কেউই বলবেন না—কবির নিজের কথাতেই 'ডিমের ভেতর রয়েছে যে শাবক, তাকে পাখী আখ্যা দেওয়া যায় না'—কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে ডিমের ভেতর থাকে বলেই একদিনের শাবকটি

আর একদিন পাখী রূপে দেখা দেয়, সুতরাং তার পক্ষী-জীবনকে সমগ্র করে জানতে হলে, তার অণ্ড-জীবনকে বাদ দিয়ে সেটা হতে পারে না।

এই পর্য্যায়ের বইগুলির মধ্যে 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' বইটির অভাব বহুদিন পর্য্যন্ত আমার পক্ষে ছিল একটি বিশেষ কষ্টের কারণ। অধুনা দুষ্প্রাপ্য হিতবাদী প্রকাশিত রবীন্দ্র-গ্রন্থাবলীতে এই বইটি যখন পড়ি, তখন আমি নিজে বালক—সুতরাং বালকের চোখ দিয়ে দেখা ভিক্টোরীয় ইংলণ্ডের সেই পথ-ঘাট ও দর্শনীয় বস্তুগুলির বর্ণনা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রীতি, সংস্কার ও সভ্যতার সেই তুলনামূলক বিতর্ক মনকে বিশেষভাবেই মুগ্ধ করেছিল, তারপর এ বই আর চোখে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা সম্বন্ধে একটা আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল অনেক দিন থেকে, কিন্তু এই বইটির অভাবেই তা হয়ে উঠে নি।

সৌভাগ্যের বিষয় এই বইটি এবং এর বারো বৎসর পরে লেখা ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী একত্র যুক্ত হয়ে ইদানীং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। যতদূর মনে হয়, পুরনো ইউরোপ প্রবাসীর পত্রে পাদটীকায় ভারতী-সম্পাদকের কিছু কিছু টিপ্পনী ছিল, বর্ত্তমানে সেগুলি দেখলাম না, দু'এক জায়গায় অল্প-বিস্তর রিপু করা হয়েছে বলেও মনে হল। তা হক, তবু বইটি পেয়ে আমি বিশেষ খুসী হয়েছি। এতে বা এর অনুগামী ডায়েরীতে আমরা যে প্রতীচ্যের দেখা পাই, প্রাক-মহাযুদ্ধের সেই সদ্য-Industrialised ইউরোপ আজ আর নেই—তার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে মহাযুদ্ধের প্রবল বন্যা, ও তার পিঠ পিঠ নানা মতবাদের তুফান—সমাজ রাষ্ট্র, শিল্প, সংস্কৃতি সমস্তই তার উল্টেপাল্টে আজ নানা মুখে ছুটে চলেছে! তবু এ লেখাগুলো পুরনো খবরের কাগজের মতো বাসি হয়ে যায় নি, তার কারণ আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে গন্তব্য

স্থানটা কোন দিনই সব চেয়ে বড় নয়, যাবার কথাটাই তার আসল জিনিষ—অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করেও সেই বিশিষ্ট শিল্পীক গুণের জন্যেই বইটি আজো সুখপাঠ্য।

রবীন্দ্রনাথ যে বয়সে প্রথম বিলাত যান, সে বয়সে সেদিন বাঙালীর ছেলের নাবালকতা ঘোচাই কঠিন ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে বাল্যেই বাঙালীত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন, সে কথা এই পত্রগুলির যে-কোন পৃষ্ঠা খুললেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে বয়সোচিত ঝাঁজ আছে এবং অহেতুক বক্রোক্তিও আছে স্থানে স্থানে—কিন্তু তথাকথিত সিভিলিয়ানদের লেখায় যে জাতীয় আত্মবিস্মৃত অভিভূতির পরিচয় পেয়ে লজ্জা করে, রবীন্দ্রনাথ ছেলে বয়সেই তা থেকে আশাতীত রকম মুক্ত ছিলেন। এ ছাড়াও ইউরোপ প্রবাসীর পত্র আর একটা দিক থেকে উল্লেখযোগ্য—মধ্য বয়সে কবি গদ্যে ধ্বনিবহুল ক্ল্যাসিকাল রীতির পক্ষপাতী হয়েছিলেন, কিন্তু সাহিত্যিক জীবনের একেবারে গোড়াতেই এই বইয়ে তিনি কথ্যভাষার শক্তি নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন। কথ্যভাষায় লেখা বাংলা বই হিসাবে ইউরোপ প্রবাসীর পত্রই হয়ত প্রথম নয়, কিন্তু সাহিত্যিক সুষমায় সমৃদ্ধ কথ্যভাষা এর আগের আর কোন বইয়েই প্রযুক্ত হতে দেখা যায় না।

রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী

১৮৭৮—কবি কাহিনী (উপাখ্যান কাব্য)

১৮৮০—বনফুল (উপাখ্যান কাব্য)

১৮৮১—বাল্মীকি-প্রতিভা (গীতিনাট্য), ভগ্নহৃদয় (কাব্যনাট্য), রুদ্রচণ্ড (কাব্যনাট্য), ইউরোপ প্রবাসীর পত্র (ভ্রমণ কাহিনী)

১৮৮২—সন্ধ্যা সঙ্গীত (কবিতা), কাল মৃগয়া (গীতিনাট্য)

১৮৮৩—বৌঠাকুরাণীর হাট (উপন্যাস), প্রভাত সঙ্গীত (কবিতা), বিবিধ প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

১৮৮৪—ছবি ও গান (কবিতা), প্রকৃতির প্রতিশোধ (নাট্য কাব্য), নলিনী (গদ্যনাট্য), শৈশব সঙ্গীত (বাল্য কবিতা সংগ্রহ), ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী (বৈষ্ণব কবিতা)

১৮৮৫—রামমোহন রায় (জীবন আলোচনা), আলোচনা (প্রবন্ধ), রবিচ্ছায়া (গান সংগ্রহ)

১৮৮৬—কড়ি ও কোমল (কবিতা)

১৮৮৭—রাজর্ষি (উপন্যাস), চিঠিপত্র (প্রবন্ধ)

১৮৮৮—সমালোচনা (প্রবন্ধ), মায়ার খেলা (গীতিনাট্য)

১৮৮৯—রাজা ও রাণী (নাট্যকাব্য)

১৮৯০—বিসর্জ্জন (নাটক), মন্ত্রী অভিষেক (রাজনৈতিক পুস্তিকা), মানসী (কবিতা)

১৮৯১—ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী (১ম খণ্ড—ভ্রমণ)

১৮৯২—চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য), গোড়ায় গলদ (প্রহসন)

১৮৯৩—গানের বহি (গান সংগ্রহ), ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী (২য় খণ্ড—ভ্রমণ)

১৮৯৪—সোনার তরী (কবিতা), ছোট গল্প (গল্প সংগ্রহ), বিদায়-অভিশাপ (নাট্যকবিতা), বিচিত্র গল্প (১ম ও ২য় খণ্ড—গল্প সংগ্রহ), কথা চতুষ্টয় (গল্প সংগ্রহ)

১৮৯৫—গল্পদশক—(গল্প সংগ্রহ)

১৮৯৬—নদী (বর্ণনাত্মক কাব্য), চিত্রা (কবিতা), সংস্কৃত শিক্ষা (১ম ও ২য় খণ্ড—পাঠ্য পুস্তক), কাব্য গ্রন্থাবলী [এই খণ্ডে অপ্রকাশিত মালিনী নাট্য ও চৈতালী কবিতা-সংগ্রহ সংযোজিত হয়]

১১৯৭—বৈকুণ্ঠের খাতা (প্রহসন), পঞ্চভূত (দার্শনিক প্রবন্ধ)

১৮৯৯—কণিকা (নীতি কবিতা)

১৯০০—কথা (গাথা কবিতা), কাহিনী (নাট্য কবিতা ও গাথা কবিতা), কল্পনা (কবিতা), ক্ষণিকা (কবিতা), গল্পগুচ্ছ (১ম ও ২য় ভাগ—গল্পসংগ্রহ)

১৯০১—নৈবেদ্য (তত্ত্ব কবিতা), বাংলা ক্রিয়াপদের তালিকা (ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তিকা)

১৯০৩—চোখের বালি (উপন্যাস), কর্ম্মফল (গল্প), কাব্যগ্রন্থ (নয় খণ্ডে—মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত)

১৯০৪—ইংরাজী সোপান (পাঠ্য পুস্তক), স্বদেশী সমাজ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী (হিতবাদী—চিরকুমার সভা উপন্যাস আকারে এই খণ্ডে প্রথম সন্নিবিষ্ট), শিবাজী উৎসব (কবিতা)

১৯০৫—স্বদেশ (দেশাত্মবোধক কবিতা), বাউল (স্বদেশী গান), বিজয়া সম্মিলন (রাজনৈতিক পুস্তিকা)

১৯০৬—আত্মশক্তি, ভারতবর্ষ, রাজভক্তি, দেশনায়ক (রাজনৈতিক পুস্তিকা), খেয়া (কবিতা), নৌকাডুবি (উপন্যাস)

১৯০৭—বিচিত্র প্রবন্ধ (প্রবন্ধ সংগ্রহ), চারিত্র পূজা (জীবনালোচনা), প্রাচীন সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), লোক সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), আধুনিক সাহিত্য (সাহিত্য প্রবন্ধ), হাস্য কৌতুক (হাস্যরসাত্মক নাটিকা), ব্যঙ্গ কৌতুক (হাস্যরসাত্মক নাটিকা)

১৯০৮—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ (চিরকুমার সভার উপন্যাস রূপ), সভাপতির অভিভাষণ (পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলন), প্রহসন (গোড়ায় গলদ ও বৈকুণ্ঠের খাতা একত্রে), রাজা-প্রজা, সমূহ, স্বদেশ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), সমাজ (সামাজিক প্রবন্ধ), কথা ও কাহিনী (কবিতা), শারদোৎসব (নাটক), গান (গীতসংগ্রহ), শিক্ষা (শিক্ষা সম্বন্ধীয় আলোচনা), মুকুট (শিশু নাট্য)

১৯০৯—শব্দতত্ত্ব (ভাষা বিজ্ঞান), ধর্ম্ম (ধর্ম্মতত্ত্ব), শান্তিনিকেতন (১ম—৮ম ভাগ—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা), ইংরাজী পাঠ (১ম ভাগ—পাঠ্যপুস্তক), ছুটির পড়া (পাঠ্যপুস্তক), শিশু (কবিতা), চয়নিকা (কবিতা সঙ্কলন), প্রায়শ্চিত্ত (নাটক)

১৯১০—রাজা (রূপকনাট্য), শান্তিনিকেতন (৯ম—১১শ ভাগ), গোরা (উপন্যাস), গীতলিপি, (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), গীতাঞ্জলি (গান)

১৯১১—শান্তিনিকেতন (১২শ ভাগ), গীতলিপি (৪—৬ খণ্ড, গান ও স্বরলিপি)

১৯১২—ডাকঘর (রূপকনাট্য), ধর্ম্মশিক্ষা, ধর্ম্মের অধিকার

(ধর্ম্মতত্ত্ব), শান্তিনিকেতন (১৩শ ভাগ), জীবনস্মৃতি (আত্মজীবনী), ছিন্নপত্র (চিঠি), অচলায়তন (রূপক নাট্য), আটটি গল্প, গল্প চারিটি (গল্পসংগ্রহ), পাঠ সঞ্চয় (পাঠ্য পুস্তক)

১৯১৪—উৎসর্গ (কবিতা), গীতিমাল্য (গান), গীতালি (গান)

১৯১৫—কাব্যগ্রন্থ (দশ খণ্ডে—কাব্য ও নাটক), গল্প সপ্তক (গল্প সংগ্রহ)

১৯১৬—চতুরঙ্গ (উপন্যাস), ফাল্গুনী (রূপক নাট্য), ঘরে বাইরে (উপন্যাস), বলাকা (কবিতা), পরিচয় (প্রবন্ধ), সঞ্চয় (প্রবন্ধ)

১৯১৭—কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম (রাজনৈতিক পুস্তিকা), গান (গীত সংগ্রহ), ধর্ম্মসঙ্গীত (গীত সংগ্রহ), গীতলেখা (গান ও স্বরলিপি)

১৯১৮—গুরু (রূপক নাট্য—অচলায়তনের রূপান্তর), গীতলেখা (২য় ভাগ—গান ও স্বরলিপি), পলাতকা (কবিতা), গীতপঞ্চাশিকা (গান ও স্বরলিপি), অনুবাদ চর্চ্চা (পাঠ্য পুস্তক)

১৯১৯—বৈতালিক (গান ও স্বরলিপি), গীতবীথিকা (গান ও স্বরলিপি), কেতকী (গান ও স্বরলিপি), জাপান যাত্রী (ভ্রমণ), শেফালি, কাব্য গীতি (গান ও স্বরলিপি)

১৯২০—অরূপ রতন (রূপক নাট্য—'রাজা'র রূপান্তর), পয়লা নম্বর (ছোটগল্প সংগ্রহ)

১৯২১—ঋণশোধ (নাটক—'শারদোৎসবে'র রূপান্তর), শিশু ভোলানাথ (শিশুকাব্য), শিক্ষার মিলন, সত্যের আহ্বান (রাজনৈতিক পুস্তিকা)

১৯২২—মুক্তধারা (নাটক—'প্রায়শ্চিত্তে'র রূপান্তর), বর্ষামঙ্গল (গান), লিপিকা (গদ্য কবিতা)

১৯২৩—বসন্ত (গীতিনাট্য), নবগীতিকা (গান ও স্বরলিপি)

১৯২৫—পূরবী (কবিতা), সঙ্কলন (প্রবন্ধ সংগ্রহ), গৃহপ্রবেশ (নাটক), প্রবাহিনী (গান), শেষবর্ষণ (গান), দেশের কাজ (রাজনৈতিক পুস্তিকা), গীতচর্চ্চা (গান সঙ্কলন)

১৯২৬—শোধবোধ (নাটক), রক্ত করবী (রূপক নাট্য), নটীর পূজা (নাটক), ঋতু উৎসব (শারদোৎসব, বসন্ত, শেষ বর্ষণ, ফাল্গুনী প্রভৃতি (ঋতুনাট্য একত্রে), গীত মালিকা (১ম ভাগ—গান ও স্বরলিপি)

১৯২৭—লেখন (অটোগ্রাফ কবিতা), ঋতুরঙ্গ (গীতিনাট্য)

১৯২৮—শেষ রক্ষা (প্রহসন—'গোড়ায় গলদে'র রূপান্তর), পল্লী-প্রকৃতি (বক্তৃতা)

১৯২৯ সমবায় নীতি (বক্তৃতা), পরিত্রাণ (নাটক—'প্রায়শ্চিত্তে'র রূপান্তর), যাত্রী (ভ্রমণ কাহিনী), যোগাযোগ (উপন্যাস), শেষের কবিতা (উপন্যাস), তপতী (গদ্য নাটক—'রাজা ও রাণী'র রূপান্তর), মহুয়া (কবিতা)

১৯৩০—গীত মালিকা (২য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), ভানুসিংহের পত্রাবলী (চিঠি)

১৯৩১—নবীন (গীতি নাট্য), পাঠ প্রচয় (২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ—পাঠ্য পুস্তক), সহজ পাঠ (১ম ও ২য় ভাগ—পাঠ্য পুস্তক), রাশিয়ার চিঠি (ভ্রমণ), গীত বিতান (১ম ও ২য় ভাগ—১১২৮টি গানের সঙ্কলন), বনবাণী (কবিতা), সঞ্চয়িতা (কবিতা সঙ্কলন), প্রতিভাষণ (৭০তম জয়ন্তী উৎসবের অভিভাষণ), শাপমোচন (গীতিনাট্য)

১৯৩২—গীতবিতান (৩য় খণ্ড—গান), পরিশেষ (কবিতা), কালের যাত্রা (নাটিকা), পুনশ্চ (গদ্য কবিতা)

১৯৩৩—দুইবোন (উপন্যাস), বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ, শিক্ষার বিকীরণ, মানুষের ধর্ম্ম (বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা), চণ্ডালিকা (গদ্য নাটিকা), তাসের দেশ (নাটিকা), বাঁশরী (নাটক), বিচিত্রিতা (সচিত্র কবিতা), ভারত পথিক রামমোহন (জীবনালোচনা)

১৯৩৪—মালঞ্চ (উপন্যাস), শ্রাবণ গাথা (বর্ষাসঙ্গীত), চার অধ্যায় (উপন্যাস)

১৯৩৫—শেষ সপ্তক (গদ্য কবিতা), বীথিকা (কবিতা), স্বরবিতান (১ম ভাগ—গান ও স্বরলিপি)

১৯৩৬—শিক্ষা স্বাঙ্গীকরণ (বক্তৃতা), চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য), পঞ্চভূত (সংশোধিত সংস্করণ), প্রাক্তনী (বক্তৃতা), পত্রপুট (গদ্য কবিতা), ছন্দ (ছন্দতত্ত্ব), শ্যামলী (গদ্য কবিতা), সাহিত্যের পথে (প্রবন্ধ), পাশ্চাত্য ভ্রমণ (ইউরোপ প্রবাসীর পত্র ও ইউরোপীয় যাত্রীর ডায়েরীর সংশোধিত সংস্করণ), বিচিত্র প্রবন্ধ (সংশোধিত সংস্করণ), স্বরবিতান (২য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), বাংলা শব্দতত্ত্ব (সংশোধিত সংস্করণ)

১৯৩৭—খাপছাড়া (হাসির ছড়া), সে (ছোটদের গল্প), জাপানে ও পারস্যে (ভ্রমণ), কালান্তর (সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ), বিশ্বপরিচয় (বিজ্ঞান), ছড়ার ছবি (ছোটদের কবিতা), প্রান্তিক (কবিতা)

১৯৩৮—স্বরবিতান (৩য় খণ্ড—গান ও স্বরলিপি), পথে ও পথের প্রান্তে (চিঠি), সেঁজুতি (কবিতা), বাংলা ভাষা পরিচয় (ভাষাতত্ত্ব), প্রহাসিনী (রঙ্গ কবিতা), সমাজ (সংশোধিত সংস্করণ), গীতবিতান (১ম খণ্ড—নূতন সংস্করণ)

১৯৩৯—গীতবিতান (২য় খণ্ড—নূতন সংস্করণ), চণ্ডালিকা (নৃত্যনাট্য), আকাশ প্রদীপ (কবিতা), শ্যামা (নৃত্যনাট্য), পথের সঞ্চয় (চিঠি), বাংলা কাব্য পরিচয় (বাংলা কবিতার সঙ্কলন)

১৯৪০—স্বরবিতান (৪র্থ ভাগ—গান ও স্বরলিপি), নব জাতক (কবিতা), সানাই (কবিতা), চিত্রলিপি (ছবি সংগ্রহ), ছেলেবেলা (বাল্য কাহিনী), তিন সঙ্গী (গল্পসংগ্রহ)

১৯৪১—আরোগ্য (কবিতা), জন্মদিনে (কবিতা), গল্পসল্প (ছোট গল্প ও ছড়া), সভ্যতার সঙ্কট (রাজনৈতিক বক্তৃতা), শেষ লেখা (কবিতা)

সম্প্রতি বিশ্বভারতী সময়ানুক্রমে সাজিয়ে কবির সমুদয় গ্রন্থাবলী বহু খণ্ডে প্রকাশ করছেন। এই 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র আনুষঙ্গিক রূপেই বেরিয়েছে কবির বাল্য রচনা সমূহেরও একটি সংগ্রহ—তার নাম 'অচলিত সংগ্রহ'।

ওপরে যে তালিকা দেওয়া হল, তা থেকে কতকগুলি সাময়িক পুস্তিকার নাম বাদ পড়ে গেছে, আর ঐ তালিকায় প্রত্যেক বইয়ের প্রকাশ কালকেই অনুসরণ করা হয়েছে—কোন-কোন আগেকার লেখা বই তাই পরে বসেছে।

গান ও স্বরলিপির ক্ষেত্রে গানগুলিই কবির রচিত—স্বরলিপি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈরী, এ ছাড়ার অন্যেরও আছে কিছু কিছু।

ইংরেজী বই

1912—Gitanjali (গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, নৈবেদ্য, খেয়া, শিশু, চৈতালী, স্মরণ প্রভৃতি বইয়ের নির্ব্বাচিত কবিতার কবি-কৃত গদ্যানুবাদ)

1913—Gardener (বিবিধ কবিতার অনুবাদ), Crescent Moon (শিশু কবিতার অনুবাদ), Chitra (চিত্রাঙ্গদার অনুবাদ)

1914—The King of the Dark Chamber (রাজার অনুবাদ —অনুবাদক ক্ষিতীশ সেন), Post Office (ডাকঘরের অনুবাদ—অনুবাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়), Sadhana (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় বক্তৃতা), Poems of Kabir (কবীরের দোঁহার অনুবাদ—Underhill-এর সহযোগিতায়)

1915—Maharani of Arakan (ডালিয়া গল্পের অনুভাবে লিখিত)

1916—Fruit-Gathering (বিভিন্ন বইয়ের কবিতার অনুবাদ), Hungry Stones and Other Stories (ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি গল্পের অন্যকৃত অনুবাদ), Stray Birds (কণিকার অনুবাদ)

1917—My Reminiscences (জীবনস্মৃতির অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর), Sacrifice and Other Plays (বিসর্জ্জন প্রভৃতি নাটকের অনুবাদ), Cycle of Spring (ফাল্গুনীর অনুবাদ), Personality (আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা), Nationalism (জাপান ও আমেরিকায় প্রদত্ত বক্তৃতা)

1918—Lover's Gift and Crossing (বিভিন্ন বইয়ের

কবিতার অনুবাদ), Mashi and Other Stories (কঙ্কাল, শুভদৃষ্টি প্রভৃতি গল্পের অনুবাদ), Stories From Tagore (গল্প সঙ্কলন). Parrot's Training (ব্যঙ্গ রচনা)

1919—Centre of Indian Culture (বক্তৃতা), The Home and the World (ঘরে বাইরের অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

1921—Greater India (রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর), The Wreck (নৌকাডুবির অনুবাদ), The Fugitive (মানসী, সোনার তরী কথা ও কাহিনী, পলাতক প্রভৃতির নির্ব্বাচিত কবিতার অনুবাদ), Poems from Tagore (কবিতা সঙ্কলন), Glimpses of Bengal (ছিন্নপত্রের অনুবাদ—অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

1922—Thought-Relics, Creative Unity (বক্তৃতা)

1924—Gora (গোরার অনুবাদ—অনুবাদক W. Pearson)

1925—Red Oleanders (রক্তকরবীর অনুবাদ), Broken Ties and Other Stories (চতুরঙ্গ এবং আরো কয়েকটি গল্পের অনুবাদ)

1931—The Child (মূল ইংরাজী কবিতা), Religion of Man (অক্সফোর্ডে প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতা)

1937—Collected Poems and Plays (সমস্ত ইংরাজী কবিতা ও নাটকের সংগ্রহ)

